বিজ্ঞান ও মানুষ

আবদুল্লাহ আল-মুতী

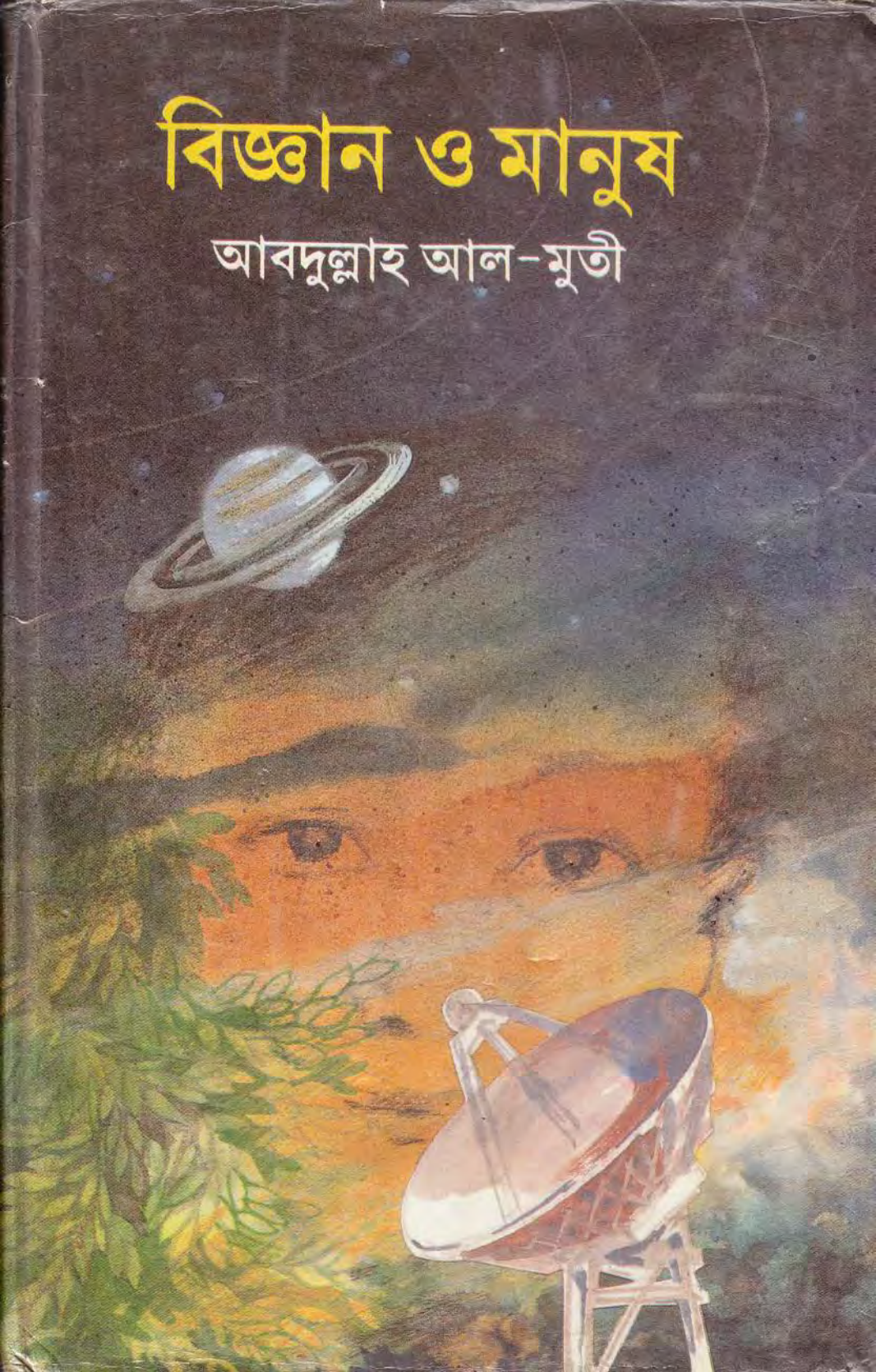

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এবইতে যেসব লেখা স্থান পেয়েছে তার সবই এর আগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ দু'যুগের বিভিন্ন সময়ের রচনা এক সঙ্গে প্রকাশ করার একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন।

১৯৫৫ সালে ছোটদের জন্য লেখা আমার কিছু রচনা একত্র করে 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে' আর 'অবাক পৃথিবী' নামে দু'টি বই প্রকাশিত হয়। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই সে-সময়ে পরামর্শ দেন বড়দের জন্য লেখা বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধগুলি একটি বইয়ের আকারে প্রকাশ করতে। এ-বইয়ের পরিকল্পনা সেই সময়ের। নানা কারণে দেরি হতে হতে, বিশেষ করে বেশ কিছুদিনের জন্য দেশছাড়া থাকায়, তখন পরিকল্পনার খেই হারিয়ে যায়। বিদেশ বাসের সময়ে লেখাগুলি ছিটিয়ে পড়ে এদিক-সেদিক, কিছু হয় বেহদিস। আবার গুছিয়ে নিয়ে বই প্রেসে দেবার জন্য তৈরি হয় ১৯৬৯ সালে। কিন্তু তখন দেশের চারদিকে উত্তাল ঢেউ-এর আলোড়ন। ছাপা পিছিয়ে যায় আরো। এমনি দেরির ফলে এখন রচনার সংখ্যা বেড়ে বই দাঁড়িয়েছে দু'টিতে —'বিজ্ঞান ও মানুষ' এবং 'এযুগের বিজ্ঞান'।

রচনাগুলি কালানুক্রম অনুযায়ী না সাজিয়ে বিষয়ের সাদৃশ্য অনুযায়ী ক'টি গুচ্ছে ভাগ করে সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন সময়ের লেখায় ভাষা ও মেজাজের কিছুটা তারতম্য থাকলেও এতে পাঠকদের পড়তে সুবিধে হবে বলে মনি করি। প্রবন্ধের শেষে প্রথম প্রকাশকাল নির্দেশ করা হয়েছে।

১৯৪৫ সালে কেবল স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে পা দিয়েছি। সে-সময়ে স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা আদৌ ছিল না— কলেজেই বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রথম আনুষ্ঠানিক পরিচয়। এমনি সময়ে প্রচণ্ড হুংকার দিয়ে বিস্ফোরিত হল প্রথম পরমাণু-বোমা। মনে প্রবল নাড়া লাগল। কলেজের বার্ষিকীর জন্য লেখা দিতে গিয়ে মনে হল এর চেয়ে উপযুক্ত বিষয় আর হয় না। তৈরি হল 'ভয়ঙ্কর পরমাণু' নামে এক রচনা। দুরু দুরু বুকে রচনাটি নিয়ে হাজির হলাম কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ অক্ষয়ানন্দ বসুর কাছে। তিনি সেদিন প্রবন্ধটি শুধু গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েন নি, তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। তিনিই বাতলে দিয়েছিলেন তেজস্ক্রিয়ার আবিষ্কারকের নামের ফরাসী উচ্চারণ আঁরি বেকেরেল। প্রবন্ধটি পরে 'পরমাণু-শক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার' শিরোনামে কলকাতার মাসিক মোহাম্মদীর ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৫২ এই দু'সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেই প্রথম রচনাটি হুবহুটি ছাপা হল। তবে কোন কোন রচনায় কিছু তথ্য সময়াতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় খানিকটা পরিমার্জনা করা হয়েছে। বন্ধুবর ডঃ জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া ও ডঃ আ. খ. ম.

ওবায়েদউল্লাহ পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া পড়ে নানা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। সেজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশের নবলব্ধ স্বাধীনতার পরিবেশে বিজ্ঞানচেতনার প্রতি তরুণ সমাজের মধ্যে এক নতুন আকর্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই চেতনার উন্মেষ ও ব্যাপ্তিতে রচনাগুলি সামান্যমাত্রায় সহায়তা করতে পারলে এই সংকলনের প্রকাশ সার্থক হবে।

যে অগণিত বিজ্ঞানরসিক সহৃদয় পাঠক–পাঠিকা ও বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ রচনাগুলি লেখার পেছনে অবিরত উৎসাহ যুগিয়েছেন এ–বইটি তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি।

আবদুল্লাহ আল–মুতী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশে যেমন অনেক দেরি হয়েছিল, দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশও তেমনি বেশ বিলম্বিত হল। প্রায় এক দশক ধরে বইটি ছাপা ছিল না। এর মধ্যে অনেক পাঠক–পাঠিকা বইটির খোঁজ করেছেন। তাঁদের আগ্রহেই অবশেষে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল।

এই সংস্করণে বইটির কাঠামো যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রেখে রচনাগুলিতে কিছুটা সংস্কার সাধন করা হয়েছে। শুধু সবশেষের রচনাটি অনুবাদকর্ম হলেও বইয়ের শিরোনামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলে নতুন যোগ করা হয়েছে। আধুনিক পরিমাপ পদ্ধতি অনুসরণ করে আগাগোড়া পরিমাপের আন্তর্জাতিক (মেট্রিক) পদ্ধতি ব্যবহৃত হল।

প্রতিটি রচনার শেষে প্রথম প্রকাশকাল নির্দেশ করা হয়েছে। সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও বইটির বিষয়বস্তু আজো সমকালীন। আর একারণেই বইটির এই নতুন সংস্করণ প্রথম সংস্করণের মতোই পাঠক–পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে বলে আশা রাখি।

আবদুল্লাহ আল–মুতী

সূচি

মানুষের প্রতিবেশ

এসো রুদ্র বৈশাখ ১১
পাতালপুরীর খবর ১৫
আকাশের অতিথিঃ উল্কা ২০
আকাশের অনন্ত রহস্য ২৫
আন্তর্জাতিক ভূ-বর্ষ ২৮

পরমাণু থেকে শক্তি

পরমাণু-শক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার ৩৭
পরমাণু-শক্তি ও সভ্যতার নবযুগ ৪৬
বিকিনি ৫০
হাইড্রোজেন-বোমা ৫৫

জীবন ও মৃত্যু

খাদ্যে প্রোটিনের সমস্যা ৬১
জীবাণু ও মানুষ ৬৫
ব্যাধি ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে ৭২
পরমাণু-শক্তির তেজস্ক্রিয় প্রভাব ৭৮

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

মরুর দেশে বিজ্ঞান ৮৯
আইনস্টাইনের আবিষ্কার ৯৮
বিজ্ঞানে উদ্ভাবন ১০৫

বিজ্ঞান ও সমাজ

বিজ্ঞানের জাদুঘর ১০৯
বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও যান্ত্রিকতা ১১৪
এযুগের জিজ্ঞাসা ১১৮
জীবন, বিজ্ঞান ও ভাষা ১২২
বিজ্ঞান ও সমাজ ১২৬

Scanned by

Shahadat Hussain

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

* সাগরের রহস্যপুরী
* শিক্ষা ও বিজ্ঞান ঃ নতুন দিগন্ত

মানুষের প্রতিবেশ

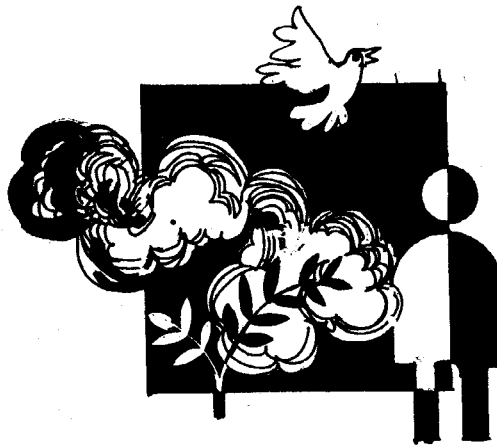

এসো রুদ্র বৈশাখ

সারা বছরের শেষে আবার আসে বৈশাখ। বেজে ওঠে মন্দ্রগম্ভীর আবাহনের সুরঃ 'এসো এসো এসো হে বৈশাখ। তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে, বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।' — বৈশাখের সাথে প্রাণে প্রাণে জাগে সাড়া। আসে নতুন দিনের আশ্বাস।

রুদ্র বৈশাখ হাজির হয় আপনাকে জানান দিয়ে; 'ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল' বিস্তার করে। পুরনো বছরের যত গ্লানি, আশা আর নিরাশার পিছুটানকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে নিষ্ঠুর বৈশাখ যেন বজ্রের আলোতে আনে নতুনের অগ্নিময় বার্তা। কবিগুরুর ভাষায়ঃ

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,
তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ুগর্জে আসে,
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে
বিদ্ধ করি হানে,
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে।

বৈশাখে প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তা কারো চোখ এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। মনে সন্দেহের লেশমাত্র থাকে না যে, নতুন বছরের আবির্ভাব ঘটেছে। কালবোশেখির দূত যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলে দেয়ঃ এসেছে, সে এসেছে। কবির ভাষায় ঃ

.... বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়;
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ;
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে;
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকলছেঁড়া কয়েদী-ডাকাতের মতো।

বৈশাখের রুদ্র রূপ ছিনিয়ে নেয় কারো প্রাণ; উড়িয়ে নেয় বাড়িঘর। আকস্মিক ওলট-পালট ঘটায় অনেক হতভাগ্য মানুষের জীবনে। — তাই মানুষ জানতে চায় কী এর রহস্য; কেন এই রুক্ষ নতুনের এমন রুষ্ট রোষ?

সেকথা জানতে হলে আমাদের তাকাতে হয় পৃথিবীর জন্মের মুহূর্ত থেকে সূর্যের সঙ্গে তার যে একেবারে নাড়ির টানের সম্বন্ধ তার দিকে। সূর্যের চারপাশে পৃথিবী ঘুরে চলেছে দিনরাত; আর পৃথিবীর বুকে যে নানা ঋতুবৈচিত্র্য, এই কক্ষপথে চলার বৈশিষ্ট্যই তার মূলে।

সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরাপথকে একটি সমতল ক্ষেত্র ধরলে তাতে পৃথিবী নিজের মেরুদন্ড খাড়া করে সোজা দাঁড়িয়ে নেই; রয়েছে একটু তেরচা হয়ে হেলে। এর ফলে সূর্যের আলো সারা বছর পৃথিবীর বিষুব রেখার ওপর খাড়াভাবে পড়ে না। পৌষ মাসে সূর্যের আলো খাড়া হয়ে পড়ে দক্ষিণ গোলার্ধের মকরক্রান্তির ওপর । উত্তরের কর্কটক্রান্তির এলাকায় তখন আলো পড়ে রীতিমতো হেলে। ঢাকা শহর কর্কট ক্রান্তিরেখার খুব কাছাকাছি; আমাদের দেশে তাই তখন শীতকাল।

আবার চৈত্র মাসে খাড়া কিরণ পড়ে বিষুবরেখার ওপরে—অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে। তারপর খাড়া কিরণ ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসতে থাকে আরো উত্তরে — এশিয়া মহাদেশের স্থলভাগে।

মহাদেশের ওপর খাড়া সূর্যকিরণ পড়ার অর্থ হল মহাদেশের মাটি পাথর তেতে ওঠা। ফলে সেখানকার হাওয়া গরম হয়ে ফেঁপে উঠতে থাকে ওপর দিকে। আর তার জায়গা নিতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসে ভেজা হাওয়া । তেতে ওঠা হাওয়ার এই টানা-পোড়েনে সৃষ্টি হয় কালবোশেখির ধুলো-ওড়ানো মত্ততা। সারাদিন ধরে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার পর বিকেলের দিকে মাটি তেতে ওঠে সবচাইতে বেশি । আর তাই তখনই দেখা দেয় কালবোশেখির প্রলয়নাচন।

রেডারের তীক্ষ্ণ চোখে যেসব বিজ্ঞানী ঝড়ো মেঘের আনাগোনার ওপর নজর রাখেন তাঁরা বলছেন, গরম হাওয়া যত ওপরে ওঠে তত বাড়ে তার বেগ। আর সেই সঙ্গে কমে হাওয়ার উষ্ণতা। হাওয়া ঠান্ডা হলে তাতে বাষ্পের কণা জমে তৈরি হয় পানির ফোঁটা । বেশি ঠান্ডা হলে পানির ফোঁটা জমে হয় শিল।

সচরাচর শিল আকারে হয় ছোট। কিন্তু কখনো শিলের আকার হয়ে ওঠে বিশাল; এমনকি সাত-আট সেন্টিমিটার চওড়া শিলও দেখা যায়। পানির ফোঁটা বা শিল যে ঝড়ো মেঘের বুকে ভেসে থাকে তার কারণ হল ওপর দিকে হাওয়ার প্রবল বেগ। বেগে ঠেলে ওঠা হাওয়াই বৃষ্টির ফোঁটা বা শিলকে ঝরে পড়ার আগ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখে। বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ওপর দিকে ছোটা হাওয়ার বেগ হতে পারে ঘন্টায় সোয়াশ' বা দেড়শ' কিলোমিটার।

পানির ফোঁটা আর শিল যত বেশিক্ষণ মেঘের মধ্যে থাকে, তত পরস্পরের সঙ্গে মিশে তাদের আকার বড় হয়। প্রায়ই হাওয়ার তোড়ে পানির ফোঁটা আর শিলের নুড়ি বেশ ক'বার ওপর নিচে ওঠানামা করে। অবশেষে ওপর দিকে ঠেলে ওঠা হাওয়া আর তাদের ভর বইতে পারে না; তখন নামে কালবোশেখির বর্ষণ। কখনো ঝরে শিলাবৃষ্টি — আমের মুকুলের রাজ্যে আর ফসলের খেতে সৃষ্টি করে মত্ত মাতঙ্গের ধ্বংসলীলা।

ঝড়ো মেঘের সঙ্গে সঙ্গে আসে কানে-তালা-লাগানো বজ্রের ডাক। বজ্রের গর্জন শুনে বোঝা যায় কোথাও নিশ্চয় বিদ্যুৎ চমকেছে। এককালে লোকে ভাবত বজ্রের ডাক

বুঝি দৈত্যদানবের যুদ্ধের হুঙ্কার। ঝড় আর বজ্রের দেবতাকে লোকে পুজোও করত। এখনো অনেকের ধারণা বুঝি মেঘে মেঘে ধাক্কা লেগেই সৃষ্টি হয় বজ্রের গুরু গুরু শব্দ। কিন্তু আসলে মেঘ তো হাওয়ায় ভেসে থাকা পানির বাষ্প। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মেঘের ঠোকাঠুকিতে নয়, আসলে বিজলি থেকেই শুরু হয় মেঘের গর্জন।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশ' বছর আগে মার্কিন বিজ্ঞানী বেনজামিন ফ্রাংকলিন ঝড়ো মেঘের ভেতর ঘুড়ি উড়িয়ে বিজলির রহস্য ভেদ করেছিলেন — সে কাহিনীটা সবার জানা। তবে রুশ বিজ্ঞানীরা দাবী করেন এ আবিষ্কারের কৃতিত্ব সে দেশের বিজ্ঞানী মিখাইল লমোনোসফের। আকাশের ঝিলিক দেয়া আগুন আর বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারের বিজলি যে একই জিনিস, সেকথা খুব সম্ভব দু'জনে প্রায় একই সময়ে প্রমাণ করেছিলেন। ফ্র্যাংকলিন পরীক্ষা করতে গিয়ে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছিলেন; কিন্তু ঝড়ো মেঘের বিজলি নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল লমোনোসফের সহকর্মী বিজ্ঞানী গেয়র্গ রিচম্যানকে।

হাওয়ার প্রবল আলোড়নে মেঘের কণায় কণায় জমতে থাকে বাড়তি ঋণাত্মক বা ধনাত্মক বিদ্যুৎ। এভাবে ক্রমে দু'টি কাছাকাছি মেঘ অথবা মেঘ আর পৃথিবীর মধ্যে বিদ্যুতের তফাত বেড়ে ওঠে। অবশেষে একসময় হাওয়ার বাধা ডিঙ্গিয়ে বিদ্যুৎকণা ছুটে যায় এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে — পৃথিবী থেকে আকাশে অথবা আকাশ থেকে পৃথিবীতে। এভাবে হাওয়ার বাধা ডিঙ্গিয়ে বিজলি চমকাতে হলে মেঘের বুকে বিদ্যুৎ জমতে হয় বহু লক্ষ ভোল্টের।

বিজলি চমকাবার সঙ্গে সঙ্গে তার আলোর ঝলকটা আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় নিমেষের মধ্যে। সে তুলনায় বজ্রের গর্জন আসে ধীর গতিতে—সেকেন্ডে মোটামুটি ৩৩০ মিটার বেগে। কাজেই বিজলির চমক দেখা দেবার পর 'মেঘের ডাক' এসে পৌঁছতে যত সেকেন্ড সময় লাগে, মেঘটা রয়েছে তত ৩৩০ মিটার বা ১/৩ কিলোমিটার দূরে। মেঘ আট-দশ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি দূরে থাকলে গর্জন প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না বললেই হয়।

কালবোশেখির ঝড়ের সঙ্গে ঘূর্ণির কথা না বললে রুদ্র বৈশাখের কথা অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আসে প্রবল ঘূর্ণি হাওয়া। খানিকটা জায়গার ওপর দিয়ে ধুলোবালির রাশি প্রবল বেগে ঘুরপাক খেতে খেতে ছুটে চলে। কখনো ঘূর্ণি মাত্র দু'তিন মিটার চওড়া আর পনের-বিশ মিটার উঁচু হয়। আবার কখনো এই ঘূর্ণি হতে পারে প্রচন্ড। ঘূর্ণির ভেতর হাওয়ার বেগ হয়ে ওঠে প্রবল— ঘন্টায় তিন-চারশ' কিলোমিটারের ওপর। তখন তাকে বলা হয়ে থাকে টরনেডো; নিমেষে বাড়িঘরের প্রচুর ক্ষতি হয় তাতে।

এমনি টরনেডো বা ঘূর্ণিঝড়ের কারণও সেই একই — খররোদে মাটি বেশি তেতে উঠে হাওয়ায় প্রবল নিম্নচাপের সৃষ্টি। নিম্নচাপের এলাকাকে ঘিরে হাওয়া চরকির মতো ঘুরতে শুরু করে প্রবল বেগে। উত্তর গোলার্ধে (তাই আমাদের দেশেও) এই হাওয়ার ঘূর্ণি ঘুরতে থাকে ঘড়ির কাঁটার উলটো দিকে।

টরনেডো যত মারাত্মকই হোক, তার আকার তেমন বড় হয় না; চওড়ায় কয়েকশ' মিটার থেকে বড় জোর এক কিলোমিটার পর্যন্ত। কিন্তু এই তীব্র ঘূর্ণিঝড় যেখান দিয়ে যায়, সেখানে সবকিছু একেবারে ছিঁড়ে খুঁড়ে মিসমার করে রেখে যায়— কখনো ঘরের চাল, গরু-বাছুর শূন্যে উড়িয়ে ছুঁড়ে দেয় বহু দূরে।

তীব্র ঘূর্ণিঝড় যখন নদী বা সমুদ্রের ওপর দিয়ে বয়ে যায় তখন সৃষ্টি হয় 'হাতিশুঁড়' বা 'জলস্তম্ভ'। ঘূর্ণির কেন্দ্রে হাওয়ার প্রবল নিম্নচাপের ফলে পানি উঠতে থাকে শূন্যে — বিরাট লম্বা হাতির শুঁড়ের মতো। শুঁড়ের তলায় নৌকা বা আর কিছু পড়লে তারও রক্ষা থাকে না।

বৈশাখ পেরিয়ে সূর্যের খাড়া কিরণ ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যায় আরো উত্তরে। মহাদেশ আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জোরালো মৌসুমী হাওয়া সাগর থেকে আমাদের দেশের ওপর বয়ে আনে ঘন কালো মেঘের সম্ভার। ঝমঝম বর্ষায় মুছে যায় বৈশাখের ধূলি-ধূসর রুক্ষতা। বিদীর্ণ, তৃষার্ত মাটিতে জাগে কোমল সবুজের স্নিগ্ধতা।

তাইতো আমরা বলি, আসুক রুদ্র বৈশাখ। 'মুছে যাক গ্লানি, মুছে যাক জরা / অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'। আর সেজন্য যদি প্রকৃতির নিয়মে আসতেই হয় বৈশাখী ঝড়, তাকে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় কি! 'ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবোশেখীর নৃত্য হোক তবে।'

আবারও কবির ভাষায় বলতে হয়ঃ

ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিময় তৃণময় পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

[১৩৭৬/১৯৬৯]

পাতালপুরীর খবর

এই পৃথিবীতে দিগন্তবিস্তৃত প্রকৃতির অপরূপ লীলাবৈচিত্র্য যুগে যুগে কবিদের কত যে কাব্য রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে, তার অন্ত নেই। পৃথিবীর মানুষ, তার সমাজ - সংসার, তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার জীবন নিয়ে দুনিয়ার দেশে দেশে কবি — সাহিত্যিকরা গড়ে তুলেছেন সাহিত্যের বিশাল রস-ভান্ডার। অথচ যে পৃথিবীর ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের কলা-সৌন্দর্যের এই বিচিত্র বিকাশ, সভ্যতা-সংস্কৃতির সৌধনির্মাণ, তার বুকের ভেতরকার খবর আমরা আশ্চর্যরকম কম জানি।

কারণটা বোঝাও অবশ্য মোটেই কঠিন নয়। হাওয়াই জাহাজ, ডুবোজাহাজ— আরো অজস্র রকম যানবাহনে পৃথিবীর ওপরটাকে বিজ্ঞানী মানুষ আজ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। তাই পৃথিবীর ওপরে আমরা এভারেস্টের চুড়োয়, গহীন সমুদ্রের তলায় অথবা আফ্রিকার অরণ্যে যখন যেখানে খুশি ছুটে যেতে পারি। কিন্তু পৃথিবীর ভেতরে সেরকম যাবার কোনো উপায় নেই।

মাটির নিচে মানুষ সব চাইতে গভীর যে গর্ত খুঁড়তে পেরেছে, গভীরতায় সেটা এগার কিলোমিটারের মতো; অথচ পৃথিবীর ঠিক মাঝখানটায় পৌঁছতে হলে এর অন্তত পাঁচ-ছ'শ গুণ খোঁড়া দরকার। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, তাহলে পৃথিবীর ভেতরকার কথা বুঝি আমরা কিছুই জানি নে। তবে যেটুকু জানি, তার প্রায় সবটা খবরই আমাদের সংগ্রহ করতে হয় নানা পরোক্ষ উপায়ে। আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণে কখনো কখনো পৃথিবীর ভেতর থেকে লাভা এবং অন্যান্য নানা জিনিস বেরিয়ে আসে; পাহাড়ের ওপরকার অংশ ক্ষয়ে গিয়ে অনেক সময় ভেতরের পাথর বেরিয়ে পড়ে; এসব থেকেও মাঝে মাঝে পৃথিবীর ভেতরকার অবস্থা সম্বন্ধে খানিকটা হদিস মেলে।

এধরনের অসুবিধের ফলে এদিকে মানুষের জ্ঞান এগিয়েছে খুবই ধীরে ধীরে। নিউটন ধরে নিয়েছিলেন যে, গোটা পৃথিবীটা সমান আয়তনের পানির প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ ভারি। কথাটাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বললে দাঁড়ায়ঃ পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব সাড়ে পাঁচ। তার প্রায় একশ' বছর পর হেনরি ক্যাভেনডিশ যখন মাধ্যাকর্ষণের সূক্ষ্ম পরীক্ষা থেকে পৃথিবীর ভর হিসেব করে বের করলেন, তখন দেখা গেল, নিউটনের অনুমান খুব ভুল হয় নি। অনেক পরীক্ষার শেষে পৃথিবীর গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব পাওয়া গিয়েছে সাড়ে পাঁচের চেয়ে সামান্য একটু বেশি—৫.৫২; এই বেশিটুকু এতই সামান্য যে, সেটা আপাতত আমাদের হিসেবের গুণতিতে না আনলেও চলবে।

এই হিসেব থেকে বোঝা গেল, পৃথিবীর ওপরকার বিভিন্ন স্তরের যা আপেক্ষিক গুরুত্ব, পুরো পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব তার প্রায় দ্বিগুণ। তাহলে পৃথিবীর ভেতরকার

বস্তু নিশ্চয়ই অতি ভারি। কেননা তা নইলে ভূত্বকের আপেক্ষিক গুরুত্বের চাইতে পুরো পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব এতটা বেশি হত না।

পৃথিবীর ভেতরের বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব এত বেশি হওয়ার জন্য অবাক হবার কিছু নেই। পৃথিবীর ভেতরকার বস্তুগুলো ওপরকার সমস্ত স্তরের প্রচন্ড চাপে ঘন হয়ে স্বভাবতই দারুন রকম ভারি হয়ে উঠেছে। তাছাড়া সুদূর অতীতে পৃথিবী যে এক সময়ে গলন্ত তরল অবস্থায় ছিল, এ-মতটিকে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই আজ মেনে নিয়েছেন। সেই তরল অবস্থায় ভারি জিনিসগুলো ক্রমে ক্রমে নিচের দিকে তলিয়ে গিয়ে পৃথিবীর মাঝখানটায় জমতে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক।

ক্যাভেনডিশের পরে আরো প্রায় একশ' বছর ধরে পৃথিবীর ভেতরকার অবস্থা সম্বন্ধে এর বেশি আর বিশেষ কিছু জানা যায় নি। এই বিশ শতকে এসে ভূ-কম্পনতত্ত্ব (Seismology) নামে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে, আর তার ফলে পৃথিবীর ভেতরের অবস্থা সম্বন্ধেও আজ সম্পূর্ণ নতুন দিক থেকে আলোকপাত হচ্ছে।

কোথাও ভূমিকম্প হলে তার চারপাশে কিছুদূর পর্যন্ত ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে বা কাঁপুনি টের পাওয়া যায়; কিন্তু আসলে মাটির নিচে এই কাঁপুনির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে আরো অনেক দূরদূরান্তরে। সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে অনেক সময় ভূমিকম্পের কাঁপুনি দুনিয়ার একেবারে অন্য পিঠ থেকেও ধরা যায়। এসব ঢেউয়ের ডাক-পেয়াদা একেবারে পৃথিবীর ভেতর দিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে আর তার সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসে এর চলার পথের, পৃথিবীর ভেতরকার নানা স্তরের মালমশলার খবর।

পৃথিবীর ওপরে অনেক ক'টা জায়গা থেকে যদি একই ভূমিকম্পের কাঁপুনি ধরা যায় তাহলে সব জায়গায় ধাক্কাগুলো একই সময়ে গিয়ে লাগে না; ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে যে জায়গাগুলো কাছাকাছি, সেখানে গিয়ে লাগে তাড়াতাড়ি । আবার যে জায়গাগুলো দূরে দূরে, সেখানে গিয়ে লাগে দেরিতে । এই যে সময়ের তারতম্য, তা থেকে হিসেব করে পাওয়া যায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে এসব ঢেউয়ের বেগ।

কিন্তু কথাটা এমনিতে শুনতে যত সহজ ঠেকছে, আসল ব্যাপারটা মোটেই অত সহজ নয়। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঢেউ যেতে সবগুলো সরাসরি একই পথ ধরে যায় না। কোনটা যায় সোজা পৃথিবীর গা ফুঁড়ে, কোনটা যায় পৃথিবীর গায়ে ঠোকর খেতে খেতে; আবার কোনটা হয়তো নিচের দিকে চলতে চলতে মাঝপথে কোন বেয়াড়া বাধায় হোঁচট খেয়ে ঠিকরে ফিরে আসে। কোনটার ঢেউ চলে আড়াআড়ি কাঁপুনি তুলে (Shake wave), কোনটার ঢেউ চলে বাতাসে শব্দের ঢেউয়ের মতো আগু পিছু ধাক্কা খেতে খেতে (Push wave)। তাছাড়া বিভিন্ন স্তর পাড়ি দেবার সময় ঢেউয়ের রূপ বদলায়, বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে নানা রকম-বেরকমের জটিল ঢেউ-এর হরফে এসব খবর এসে ধরা দেয়। কেমব্রিজের হ্যারল্ড জেফ্রিজ আর ক্যালিফোর্নিয়ার বেনো গুটেনবার্গ নামে দু'জন বিজ্ঞানী এসব ঢেউয়ের হরফ পড়বার কায়দা আবিষ্কার করেছেন।

এমনি ঢেউয়ের লিপি থেকে এপর্যন্ত যে খবর উদ্ধার করা গিয়েছে, তার সব চাইতে বড় কথাটা এই যে, পৃথিবীর ভেতরে একটা শাঁসালো অংশ আছে, বাইরের খোলস থেকে সেটা আলাদা। কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় অর্ধেক জায়গা জুড়ে

রয়েছে এই কেন্দ্রবস্তু । দেখা গিয়েছে, কেবল আগুপিছু ঢেউয়েরাই এই শাঁসালো কেন্দ্র পাড়ি দিতে পারে, আড়াআড়ি ঢেউগুলো এতে আটকা পড়ে যায়। এ বিশেষত্বটা হচ্ছে বিশেষ করেই তরল পদার্থের । তাই এথেকে বোঝা যায় এই কেন্দ্রবস্তুটা কঠিন নয়, তরল। বাইরের খোলসটা আর সব সাধারণ কঠিন বস্তুর মতো ভূমিকম্পের দু'রকম ঢেউকেই চালান দেয়।

সাধারণত ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় জমিনের অল্প কয়েক কিলোমিটার নিচেই—বহু বছর ধরে ক্রমাগত চাপ পড়ে পড়ে কোন ভূ-স্তর হঠাৎ ভেঙ্গে পড়লে। কখনো কখনো খানিকটা বেশি নিচে হলেও, ছ'শ কিলোমিটারের নিচে ভূমিকম্প ঘটতে দেখা যায় না। এই সীমানায় এসে হঠাৎ ভূমিকম্প সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে মনে হয় সেখানে প্রচন্ড চাপের ফলে ভূ-স্তর এমন নমনীয় হয়ে পড়েছে যে, তাতে ভূমিকম্পের মতো কোন আকস্মিক বিপর্যয় ঘটা সম্ভব হয় না।

তাহলে আধুনিক ভূ-কম্পন তত্ত্বের এসব ঢেউয়ের পরীক্ষা থেকে পৃথিবীর ভেতরকার যে ছবি আমরা পেলাম তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ছ'শ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা তরল কেন্দ্র আর তার চারধারে আরো প্রায় ছ'শ কিলোমিটারের এক কঠিন আবরণ। ভূমিকম্পের ঢেউয়ের বেগ থেকে জানা যায়, এই কঠিন খোলসটা পাথর দিয়ে তৈরি আর যতই পৃথিবীর ভেতরের দিকে নামা যায়, এই পাথরের ঘনত্ব ততই বাড়তে থাকে। ভেতরের কেন্দ্রটা তরল হলেও বাইরের আগাগোড়া পাথরের খোলসের চেয়ে অনেক বেশি ঘন — প্রায় দ্বিগুণ।

ভেতরের এই তরল কেন্দ্রের উপাদান যে কী হওয়া সম্ভব, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার বিরাম নেই। পৃথিবীর ভেতরের চাপ অত তীব্র হলেও একমাত্র গলন্ত ধাতু ছাড়া আর কোন জিনিসের ঘনত্ব এত বেশি হতে পারে না। তাই মনে হয়, সম্ভবত এই কেন্দ্র কোন রকম ধাতু দিয়ে তৈরি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সবাই মনে করতেন, এই ধাতুটা লোহা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা ধাতুটা এমন হওয়া দরকার যা পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, আবার অন্য জিনিসের সঙ্গে কিছুটা মেশামেশি বাঁচিয়েও চলতে পারে। লোহার এ-দুটো গুণই আছে, তাছাড়া এর ঘনত্বও হিসেব মতো ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে।

পৃথিবীর কেন্দ্রবস্তুতে লোহার ভাগের আধিক্য থাকার পক্ষে আরেকটা যুক্তি এই যে, বাইরের আকাশ থেকে পৃথিবীর ওপর মাঝে মাঝে উলকাপিন্ডের আকারে লোহার টুকরো এসে পড়ে। বিজ্ঞানীদের একটা মত হল, পৃথিবীর মতোই কোন গ্রহ এক সময়ে আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল— তা থেকেই এসব উলকাখন্ডের উৎপত্তি। আবার অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, যে বিশাল বস্তুপুঞ্জ থেকে সৌরজগতের সৃষ্টি, এসব উলকাখন্ড তারই অবশিষ্ট।

মাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডব্লু. এইচ. র‍্যামজে নামে একজন বিজ্ঞানী এক বিকল্প সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে আমরা জানি, যথেষ্ট পরিমাণে চাপ দেয়া হলে যে-কোন জিনিসই ধাতুর মতো আচরণ করে। র‍্যামজের মতে, সম্ভবত

পৃথিবীর ভেতরকার তরল ধাতব অংশের উপাদান বাইরের পাথুরে খোলসের উপাদান থেকে অভিন্ন— কেবল প্রচন্ড চাপেই তা ধাতুর রূপ নিয়েছে। এই ধারণা অনুসারে ঠিক যেখান থেকে এই পরিবর্তন ঘটাবার মতো যথেষ্ট চাপের শুরু সেখান থেকেই শাঁসালো কেন্দ্রেরও শুরু। পরিমাণগত পরিবর্তন (এখানে চাপ) একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছলে যে গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়, এটা তার এক দৃষ্টান্ত।

চাঁদ এত ছোট যে, তার ভেতরে এই পরিবর্তন ঘটাবার মতো যথেষ্ট চাপ নেই। তাই তার ভারি শাঁসও নেই;সেজন্যই চাঁদ এত হালকা। বুধ, শুক্র, মঙ্গল—এসব গ্রহের সঙ্গে নানা দিক দিয়ে পৃথিবীর মিল রয়েছে। কাজেই এ-অনুমান খুব স্বাভাবিক যে, এসব গ্রহের গড়নও হয়তো অনেকটা পৃথিবীর মতোই হবে। সাম্প্রতিক পরীক্ষা থেকে মনে হয়, বুধ ওজনে বেশ ভারি অথচ গ্রহদের পরিবারে সে হচ্ছে সবার ছোট। একথা সত্যি হলে বুঝতে হবে, বুধ হয়তো লোহার মতো কোন ভারি ধাতব বস্তু দিয়েই তৈরি। এটা র‍্যামজের সিদ্ধান্তের একটা ব্যতিক্রম।

অবশ্য এ ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যাও খুব কঠিন নয়। হালকা গ্যাসীয় সূর্যের চারধারে বস্তুপুঞ্জ চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে যখন গ্রহলোকের জন্ম হয়েছিল, তখন এই বস্তুপুঞ্জের ভারি অংশ ঘূর্ণায়মান বস্তুর সাধারণ নিয়ম অনুসারে স্বভাবতই গিয়ে জমেছে ভেতরের দিকে সূর্যের কাছাকাছি গ্রহে; আর হালকা উপাদানগুলি ছড়িয়ে পড়েছে বাইরের দিকে, জড়ো হয়েছে সূর্য থেকে দূরের বিভিন্ন গ্রহে। সৌরমন্ডলের বাইরের দিককার গ্রহগুলোর গড়ন যে আমাদের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এগুলো আকারে অতি বিশাল, কিন্তু এত বিরাট আকার সত্ত্বেও ঘনত্বে পৃথিবীর চেয়ে অনেক হালকা। এমনকি দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ শনি পানির চাইতেও হালকা। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, আগাগোড়া বৃহস্পতি গ্রহটাই হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে তৈরি, কিন্তু তার কেন্দ্রে প্রচন্ড চাপে এই হাইড্রোজেন ধাতব রূপ নিয়েছে। সম্ভবত এসব গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহের বেশির ভাগই এমনি কঠিন হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি।

কি রকম চাপে অন্যান্য জিনিসও ধাতব রূপ নেয়, সে-সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে না পারা পর্যন্ত পৃথিবীর কেন্দ্র ঠিক কি উপাদানে তৈরি, সে-প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। এ যাবৎ গবেষণাগারে কেবল ফসফরাসকেই তীব্র চাপ প্রয়োগ করে ধাতুর রূপ দেয়া সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য জিনিসকে ধাতুতে রূপান্তরিত করার মতো চাপ এখনো গবেষণাগারে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। তবে হাইড্রোজেনের বেলায় এই 'চরম চাপের' পরিমাণ কত হবে, তা বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বের করেছেন। পৃথিবীর ভেতরে যে পরিমাণ চাপ, এটা তার চাইতে অনেক বেশি। তবে এমন হতে পারে যে, পৃথিবীর ভেতরের চাপে পাথর ধাতব রূপ নেয়, আর সেখানে যা তাপমাত্রা, তা এই রূপান্তরিত ধাতুকে গলিয়ে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য পৃথিবীর ভেতরে চাপের ফলে তৈরি ধাতুর সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে সাধারণ লোহাও মিশে থাকা সম্ভব।

খনির ভেতরে যত নামা যায়, পৃথিবীর ওপরকার চেয়ে তাপমাত্রা ততই বাড়তে থাকে। এই বাড়তির হার অবশ্য অনেকখানি নির্ভর করে বিভিন্ন স্তরের বিশেষত্ব এবং

স্থানীয় প্রকৃতির ওপর। তবু সাধারণভাবে বলা চলে, পাঁচ থেকে দশ কিলোমিটারের মধ্যেই পানি ফোটার মতো তাপ উঠে যায় এবং এর নিচেও তাপ ক্রমাগত বেড়ে চলে। আগ্নেয়গিরি থেকে যে গলন্ত লাভা বেরিয়ে আসে, তার তাপমাত্রা হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। এসব গলন্ত লাভার জন্মকাহিনী এখনো রহস্যময় ঃ কেননা, ভূমিকম্পের ঢেউয়ের সাহায্যে পৃথিবীর নিচে তিন হাজার কিলোমিটারের মধ্যে কোন তরল স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় নি। সম্ভবত পৃথিবীর গভীর স্তরে শুধু বিশেষ বিশেষ জায়গাতেই লাভা জমে থাকে। পাথরের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে যে-সব তেজস্ক্রিয় ধাতু মিশে আছে, তার বিকিরণ থেকে উৎপন্ন তাপ গভীর মাটির নিচ থেকে বেরোবার পথ না পেলে সেখানেই জমতে থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই তাপ এত বেড়ে ওঠে যে, তা পাথর পর্যন্ত গলিয়ে ফেলে।

পৃথিবীর গভীর কেন্দ্রের তাপমাত্রা যে কত তা ঠিকমতো জানবার কোন উপায় নেই। বিভিন্ন সময়ে যেসব আনুমানিক হিসেব বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন, তাও পৃথিবী জন্মের নানা রকম অনিশ্চিত তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে। এর মধ্যে কেবল এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ভেতরের তাপমাত্রা এত বেশি যাতে ভেতরের কেন্দ্রবস্তু গলে যেতে পারে, অথচ তার বাইরের খোলসটা না গলে। অতিরিক্ত চাপে পদার্থের গুণাগুণ কিভাবে বদলায়, সেটা নির্দিষ্টভাবে জানা না থাকায় এথেকে ভেতরের উষ্ণতার কোন রকম সঠিক হিসেব পাওয়া দুষ্করঃ এক হাজার থেকে দশ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত যে কোন তাপমাত্রা হলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।

পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে; তাই কম্পাসের চুম্বক-কাঁটা সব সময় উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কম্পাসের কাঁটা যেদিকে মুখ করে থাকে, সেই চৌম্বক মেরু আর ভৌগোলিক মেরু — অর্থাৎ যে অক্ষের ওপর পৃথিবী দৈনিক আবর্তন করে, তার প্রান্ত — এক নয়। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এই চৌম্বক-মেরু সব সময় এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না, আপনা আপনি ক্রমে ক্রমে সরে যায় ; আবার কয়েকশ' বছর পরে হয়তো আগের জায়গায় ফিরে আসে।

গত কয়েক দশকের গবেষণা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা গিয়েছে, পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্র আর তার পরিবর্তনের আসল উৎস হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্রবস্তুতে। বাইরের কঠিন আবরণে অত্যন্ত ধীরে ধীরে যেসব ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে তা দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। পৃথিবীর কেন্দ্র তরল বলে সহজেই নড়াচড়া করতে পারে। আর ধাতু দিয়ে তৈরি হওয়ায় এর ভেতরে বিদ্যুৎপ্রবাহও চলাচল করে অবাধে। ভেতরের এইসব বিদ্যুৎ পরিবাহক বস্তুপুঞ্জের সঞ্চালনের ফলে পৃথিবীর ওপরের স্তরে পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

কাজেই পৃথিবীর কেন্দ্রে কিভাবে আলোড়ন হয় আর বিদ্যুৎপ্রবাহের সঞ্চার হয়, বিজ্ঞানীরা যদি তার ব্যাখ্যা দিতে পারেন, তাহলে ওপরের চৌম্বক ক্ষেত্র আর তার পরিবর্তনের রহস্যও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়ে আসবে। আজকের বিজ্ঞানীরা এদিকেই তাঁদের গবেষণা চালাচ্ছেন।

[১৩৬১/১৯৫৪]

আকাশের অতিথি ঃ উল্কা

নভেম্বর মাসে রাতের আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে। ধোঁয়াটে নীল চাঁদোয়ার ওপর তারাদের যেন মেলা বসে যায়। এমনি এক তারা-ঝলমল রাতে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখা যাবে যেন একটা উজ্জ্বল বিন্দু কোনখানে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে গেল। সাধারণ লোকে হয়তো বলবে একটা 'তারা ছুটল'। আর সত্যি সত্যি মনেও হয় তাই—কোথাও যেন একটা তারা স্থানচ্যুত হল। কিন্তু শিক্ষিত কোন মানুষই আজ আর এমন কথা বিশ্বাস করবে না। কারণ আমরা জানি, এক একটা তারা গোটা পৃথিবীর চাইতেও বহুগুণে বড় আর সেগুলো এভাবে কখনো পড়ে না।

সেবার গ্রামে গিয়ে শুনি, পাশের বাড়ির আফসার খাঁ পরী দেখে 'তরাস' লেগে মারা গেছে। ভাল করে শুনলাম ব্যাপারটা। আফসার খাঁ রাতে একা একা বাইরে বেরিয়েছিল। কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে এসে বল্‌ল, পরী উড়ে যেতে দেখেছে। সেই যে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসে বিছানায় পড়ল, আর উঠল না। ঘরের ভেতর থেকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে আরো অনেকেই দেখেছিল— হঠাৎ কয়েক সেকেন্ডের জন্য সমস্ত পুবের আকাশ আলো হয়ে গেল। সেই চোখ-ঝলসানো আলোর পিন্ড উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে সরে গেল। এই আগুনের গোলা দেখে আশপাশের কয়েক গ্রামের আরো অনেকেই ভয় পেয়েছিল।

সবাই বুঝতে পারবেন, ওই 'তারা ছোটা' বা পরীর আলো আর কিছু নয়— যাকে বলে উল্কাপাত তাই। আর এই উল্কাপাত দেখে ভয় পাওয়াও আজকের নতুন ব্যাপার নয়। এমনকি বহু প্রাচীনকালে লোকে উল্কাকে দেবতা মনে করে পুজো করত, ইতিহাসে এমন নজির আছে।

এই উল্কাগুলো হচ্ছে আকাশে ভ্রাম্যমান কঠিন বস্তুপিন্ড – ছোট বড় নানান আকারের পাথর বা ধাতুর টুকরো। এরা অন্যান্য গ্রহের মতো নিজ নিজ কক্ষপথে ঝাঁক বেঁধে সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। অনেক বিজ্ঞানীর মতে এগুলো এককালে ধূমকেতুর অংশ বিশেষ ছিল। উল্কারা অনেক সময় ধূমকেতুর কক্ষপথেই ঝাঁক বেঁধে ঘোরে। কিন্তু ধূমকেতুর সঙ্গে উল্কার তফাতও আছে। ধূমকেতু হল ধুলো আর গ্যাসের পিন্ড—পৃথিবী থেকে বহু কোটি মাইল দূরে রয়েছে। এগুলো মানুষের চোখে পড়ে সূর্যের প্রতিফলিত আলোর দরুন। আর উল্কারা জ্বলে গনগনে গরম বলে। তাদের দেখা যায় আকাশে পৃথিবীর মাত্র সত্তর-আশি কিলোমিটার ওপরে।

উল্কাপাত বছরের সব সময় দিনে রাতে কিছু হয়েই থাকে। এদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে এরা দল বাঁধা পঙ্গপালের জাত। লাখে লাখে চলেছে ভিড় করে এক রাস্তায়। বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে পৃথিবী গিয়ে পড়ে ঠিক যেখানটায় ওদের জটলা সেইখানে। পৃথিবীর টান সামলাতে না পেরে ওরা রাশি রাশি পৃথিবীর ওপর এসে পড়তে থাকে। বছরের মধ্যে নভেম্বর মাসের ১২, ১৩, ১৪ ও ২৭ তারিখের রাতে উল্কার ফুলঝুরি দেখার জিনিস। আরো ক'টা দিন হচ্ছে ২১ এপ্রিল, ৯, ১০ ও ১২ আগস্ট।

আমাদের পৃথিবীর চারধারে বহুদূর পর্যন্ত হাওয়ার আবরণ দিয়ে ঘেরা। তাই এসব উল্কাপিন্ড অতি তীব্র বেগে ছুটে আসার সময় এদের গায়ে আগুন ধরে যায়; তখনই আমরা তাদের দেখতে পাই। বিজ্ঞানীরা উল্কার উচ্চতা ও বেগ হিসেব করে বের করেছেন। জ্বলার সময় উচ্চতা থাকে মাটি থেকে গড়ে ৯০ কিলোমিটার আর বেগ সেকেন্ডে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার। উল্কারা এত জোরে ছোটে (কামানের গোলার চাইতে ৫০ থেকে ১০০ গুণ বেগে) যে, বাতাসের বাধা পেয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আর উত্তাপে গন্‌গনে সাদা হয়ে বাষ্প হয়ে যেতে থাকে।

উল্কা নানা আকারের। কতকগুলো খুবই ছোট ছোট, এমনকি ধুলোর মতো পর্যন্ত হয়। এরা জ্বলতে জ্বলতে মাটিতে পড়ার অনেক আগেই ছাই হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। এগুলোকে দেখে লোক বলে 'তারা ছুটল'। আবার কোন কোন উল্কা খুবই বড়— এমনকি কয়েক টন পর্যন্ত ওজন হয়। এগুলো বায়ুর স্তরের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে একেবারে জ্বলে ছাই হয়ে যেতে পারে না; যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটা বিরাট পাথরের চাঁই-এর মতো মাটির বুকে এসে পড়ে। বড় বড় উল্কা পড়ার সময় বিরাট আগুনের গোলার মতো দেখায়; জ্বলতে জ্বলতে ভীষণ শব্দে ফেটেফুটে চারদিক ছারখার করে পড়ে। এমনি চোখ-ধাঁধানো আগুনের গোলা দেখেই লোকে পরীর আলো বলে ভুল করে।

রাতদিন অসংখ্য উল্কাপাত হচ্ছে। তবে বড় উল্কা মাটিতে খুব বেশি পড়ে না। আবার যা-ও বা পড়ে সে-ও যেখানে সেখানে, যে কোন জায়গায়ই পড়তে পারে। কিছু পড়ে সমুদ্রের পানিতে, কিছু মেরুর বরফের মধ্যে, কিছুবা জনশূন্য পর্বতে, বনেপ্রান্তরে। এপর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বড় রকম উল্কাপাতের হিসেব রাখা হয়েছে। আজকাল প্রত্যক্ষ দেখা কোন উল্কা পেলেই সেটাকে জাদুঘরে নিয়ে যত্নের সঙ্গে রেখে দেওয়া হয়। তারপর বিজ্ঞানীরা তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন।

যে বছর কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন সেবারও অর্থাৎ ১৪৯২-এর নভেম্বর মাসে 'আলসেস' নামে একটা জায়গায় প্রায় একশ বিশ কেজি ওজনের এক বিরাট উল্কার খন্ড পড়েছিল। সেখানকার লোকে সেটাকে তুলে নিয়ে খুব ভক্তিভরে স্থানীয় গির্জার ছাদের সঙ্গে শেকল দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। এযাবৎ তারিখসহ যেসব উল্কা রক্ষা করা হয়েছে, এটা তাদের মধ্যে সব চাইতে পুরনো। ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রায় ৬০০ উল্কা সংগৃহীত হয়েছে।

গ্রীনল্যান্ড থেকে ১৮৯৭ সালে অ্যাডমিরাল পেরি ৩৬ টন ওজনের যে উল্কাটা **এনেছিলেন,** সেটা নিউইয়র্কের আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্টরি-তে রক্ষিত আছে।

নানা জায়গায় কুড়িয়ে পাওয়া উল্কাপিন্ড পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, সেগুলো সাধারণত লোহা, নিকেল আর পাথরের তৈরি। ওপরটা প্রায়ই গলে এবড়ো থেবড়ো হয়ে থাকে। কোন কোন সময় উল্কার মধ্যে খুব ছোট ছোট দামী পাথরও পাওয়া যায়। 'প্যানেথ' নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী তেজস্ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হিলিয়ামের পরিমাণ হিসেব করে উল্কার বয়স স্থির করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর হিসেব মতো প্রায় দু'শ কোটি বছর আগে এগুলো কঠিন হয়ে এসেছে। এর ফলে পৃথিবী ও অন্যান্য সৌর-গ্রহের জন্মের কাছাকাছি সময়েই যে উল্কাপুঞ্জেরও উৎপত্তি হয়েছে, এ-রকম একটা অনুমান করা যায়। এর খুব অল্পসংখ্যক উল্কাই জনবসতিপূর্ণ জায়গার ওপর পড়ে তেমন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এটা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু তবু প্রাগৈতিহাসিক কালের বড় রকম উল্কাপাতের ক্ষতচিহ্ন পৃথিবীর বুকে বড় কম নেই। আমেরিকার ভার্জিনিয়া ও জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের মাঝামাঝি প্রায় একলক্ষ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে অসংখ্য ডিমের আকৃতির হ্রদের মতো গর্ত দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ভূতত্ত্ববিদ বিজ্ঞানী মনে করেন, ওগুলো কোন ধূমকেতু থেকে ছিটকে আসা এক ঝাঁক উল্কাপাতেরই ফল।—পৃথিবীর সবচাইতে বিখ্যাত উল্কাপাতজনিত গর্ত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে অ্যারিজোনার কাছাকাছি উইন্‌স্‌লো নামে জায়গায়।

এই শতাব্দীতে পৃথিবীতে আরো কতকগুলো বড় রকমের উল্কাপাত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে চাষী সেমেনভ ও পশুপালক লুচেটকানের বিবরণ উল্লেখ করা যায়।

১৯০৮ সালের ৩০ জুন, সকাল সাতটা। উত্তর-মধ্য সাইবেরিয়ার 'কান্‌স্ক'-এর কাছে সেমেনভ নামে একজন চাষী তার ঘরের রোয়াকে বসে ছিল। হঠাৎ সে দেখল, আকাশের উত্তর দিক থেকে সূর্যের চাইতেও বড় একটা ভয়ঙ্কর নীলচে গোলা গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসছে —আর কী তার জেল্লা! সেমেনভের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এই আগুনের গোলাটা গিয়ে পড়ল ইনিসি ও লেনা নদীর মধ্যেকার জনহীন পাহাড়ী জায়গায়। যেখানে পড়ল, সেখান থেকে সহসা একটা আলোর স্তম্ভ উঠে গেল খাড়া আকাশের দিকে।

আসলে এই আলো ছিল সেমেনভের বাড়ি থেকে আশি কিলোমিটার দূরে। কিন্তু এত দূরে থেকেও এত বেশি তাপ বোধ হল যে, সেমেনভের মনে হতে লাগল আগুনের হলকায় তার কাপড়-চোপড় এখনই জ্বলে উঠবে। খানিকক্ষণ পর শোনা গেল একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। বাতাসের ধাক্কায় সেমেনভ তো রোয়াক থেকে ছিটকে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তার বাড়িটাও হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল।

ওই রহস্যজনক আলোর জায়গাটার দিকে পশুপালক লুচেটকানের হাজার দেড়েক বলগা হরিণ চরে বেড়াচ্ছিল। যে বাতাসের ধাক্কা সেমেনভের গায়ে লেগেছিল, কয়েক

সেকেণ্ড আগে সেই বাতাসের ধাক্কাতেই সমস্ত হরিণের পাল একসঙ্গে নিকেশ হয়ে গেল। পরে কেবল কয়েক টুকরো পোড়া হাড় ছাড়া তাদের আর কিছু পাওয়া যায় নি।

সাড়ে দশ কিলোমিটার দূরে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের একটা ট্রেন থেকে যাত্রীরা দেখতে পেয়েছিল উত্তর-পুব দিকে হঠাৎ একটা তীব্র আলোর ঝলকানি। আর তার পরেই গাড়িটা এমন প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিতে আরম্ভ করেছিল যে, লাইনে ছেড়ে উলটে পড়ে এই ভয়ে তক্ষুণি ইঞ্জিন থামিয়ে ফেলতে হয়। আটশ' কিলোমিটারের বেশি দূরে ইরখুটস্ক শহরের সাইস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে টের পাওয়া গেল, বাইরে থেকে কোন ভারি বস্তু এসে পৃথিবীর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে— ব্যারোগ্রাফ যন্ত্রে বাতাসের ধাক্কা বোঝা গেল। এমনকি ঘটনাস্থল থেকে প্রায় সাড়ে ছ'হাজার কিলোমিটার দূরে ইংলণ্ডের 'কিউ' মানমন্দিরে রাখা সূক্ষ্ম মাইক্রোব্যারোগ্রাফে টের পাওয়া গেল বাতাসের চাপ।

দিন কেটে যেতে লাগল। ঘটনাটার কথা লোকে একরকম ভুলেই গিয়েছিল। তারপর ১৯২৭ সালে এল. এ. কুলিক নামে একজন অধ্যাপক ওই জায়গাটায় অনুসন্ধান চালালেন। দেখা গেল ওখানে প্রায় দু'শ প্রকাণ্ড গর্ত হয়ে রয়েছে। তার মানে ওখানে একঝাঁক উল্কা এসে পড়েছিল; আর তারই ফলে আশেপাশে বিশ-ত্রিশ কিলোমিটার ধরে প্রায় দু'হাজার বর্গ কিলোমিটার বনভূমি এমনভাবে মাটিতে মিশেছিল, যেন একটা বিরাট দৈত্য এসে থাপ্পড় দিয়ে সব গাছগুলোকে শুইয়ে দিয়ে গেছে।

১৯০৮-এর সেদিন সৌভাগ্যক্রমে মানুষের ওপর দিয়ে একটা ভয়ঙ্কর ফাঁড়া কেটে গেছে। ওরকম জনহীন জায়গায় না পড়ে ওই উল্কার ঝাঁকটা যদি নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারি বা কলকাতার মতো কোন বড় শহরের ওপর পড়ত তাহলে ইতিহাসের একটা শোচনীয়তম দুর্ঘটনা ঘটে যেত।

আমেরিকার 'হোপি' নামে এক জাতের রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে একটা প্রচলিত উপকথা আছে। তাদের 'মহান দেবতা' এক সময়ে আকাশের স্বর্গরাজ্য থেকে আগুন আর বজ্রের মধ্যে নেমে এসে মাটির পৃথিবীর ভেতর ঢুকে পড়েছিলেন। তারা সেই গর্তটা পর্যন্ত দেখিয়ে দিতে পারে। এটা হচ্ছে অ্যারিজোনা মরুভূমির পাথুরে, কাঁকর ভরা মাটির মধ্যে একটা বিরাট গহ্বর — চওড়ায় প্রায় ১৬০০ মিটার আর গভীরতায় ৪০০ মিটার। তার পাড়টা আশেপাশের জমিনের চাইতে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিটার উঁচু হয়ে আছে।

এখানে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সাইবেরিয়ার উল্কার চাইতেও বড় একটা ধূমকেতু মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীর ওপর এসে পড়েছিল। এটার প্রায় আগাগোড়াই ছিল লোহা আর নিকেল। ওজন ছিল অন্তত কয়েক লক্ষ টন। সম্ভবত সেকেণ্ডে ষাট কিলোমিটার বেগে উটাহ অঙ্গরাজ্যের ওপর দিয়ে তেরচাভাবে উড়ে এসে এটা অ্যারিজোনার ওপর পড়েছিল—এখন যেখানটায় উইন্‌সলো শহর সেইখানে। তাতে যে ভীষণ শব্দ আর ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল, তা বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে না। এর ভয়ঙ্কর ক্ষমতা সম্বন্ধে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এটা শক্ত পাথরকে চূর্ণ করে আটশ' মিটার নিচে গিয়ে ঢুকেছিল। মূল্যবান ধাতুর লোভে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

এই বিরাট উল্কার চাঁইটাকে মাটি খুঁড়ে বার করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এর অস্তিত্ব টের পাওয়া গেলেও এটা এত শক্ত পাথরের নিচে রয়েছে যে, ওপরে তোলা সম্ভব হয় নি।

১৯৩৭ সালের শরৎকালে জ্যোতির্বিদরা একটা বিরাটকায় বস্তুকে পৃথিবীর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে দেখেছিলেন। এটার সঙ্গে ধাক্কা খেলে আমাদের পৃথিবীর অনেকখানি একেবারে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু নেহাৎ আমাদের কপাল-জোরে মাত্র চার ঘন্টার আগে-পিছুর দরুন এই দুর্ঘটনাটা ঘটতে পারে নি।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বেশির ভাগ বিজ্ঞানী বিশ্বাসই করতেন না যে, আকাশ থেকে কখনো পাথর পড়তে পারে। কিন্তু তার পরের কয়েক দশকের মধ্য আকাশ থেকে সত্যি সত্যি যে খুব ঘন ঘনই উল্কা পড়ে, এসত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ আমরা জানি যে, প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ উল্কা পৃথিবীর বায়ুস্তরের মধ্য দিয়ে ছুটে আসছে।

ধূমকেতু আর উল্কা সম্বন্ধে মানুষের মনে যে নানা রকম আজগুবি কুসংস্কার ও ভুল ধারণা এতদিন জমা হয়ে ছিল, সেগুলো আজ ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে। এগুলো আজ আর ভৌতিক কিছু নয়, সম্পূর্ণ জলজ্যান্ত গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেকের ধারণা উল্কা যখন মাটিতে পড়ে তখন বুঝি সেগুলো গন্‌গনে গরম থাকে। কিন্তু এ ধারণা সব সময় ঠিক নয়। একেবারে খুব বড়গুলো বাদে সাধারণ উল্কা যখন মাটিতে পড়ে তখন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েই আসে। বাতাসের বাধা পেয়ে জ্বলে উঠলে তাপ অবশ্য হয় খুবই। প্রায় চার হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠে। কিন্তু পৃথিবীর ওপরের ঘন বাতাস তাদের এত বেশি বাধা দেয় যে, জমিনের পনের-বিশ কিলোমিটার ওপর থেকেই গরম হওয়া বন্ধ হয়ে যায়, তারপর তারা ঠান্ডা হতে আরম্ভ করে। মাটিতে পড়লে অবশ্য ওপর দিকে একটা গলন্ত ধাতুস্তর দেখা যায়—তাই দেখেই উল্কা চেনা সহজ হয়। বিজ্ঞানীরা যখন যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে উল্কা খুঁজতে বেরোন, তখন লোহা আর নিকেলের আধিক্য দেখেও তাঁরা উল্কা চিনতে পারেন।

উল্কাপিণ্ডেরা হচ্ছে একমাত্র বস্তুখন্ড যা বাইরের মহাবিশ্ব থেকে অতিথি হিসেবে আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়ে—আমরা তাদের ধরে ছুঁয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে পারি। সে হিসেবে এদের গুরুত্ব অনেক। কে জানে, হয়তো এই উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করেই বিশ্বের জন্মরহস্যের কিনারা করা সম্ভব হবে। এজন্যই অধুনা সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা উল্কার দিকে খুব নজর দিতে আরম্ভ করেছেন। গভীর আগ্রহ নিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করছেন।

[১৩৫৪/১৯৪৭]

আকাশের অনন্ত রহস্য

রহস্যই সর্বাতীত সৌন্দর্যের প্রতীক। এই অনুভূতির সঙ্গে যার পরিচয় ঘটে নি, অনন্ত রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যার মন অপার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয় না, ধরতে হবে তার মৃত্যু হয়েছে—তার মন আর চোখ দুইয়েরই। – আলবার্ট আইনস্টাইন।

অমাবস্যার রাতে তাকাবেন নির্মেঘ আকাশের দিকে। তারায় তারায় ছাওয়া আকাশের বুকে কী গভীর রহস্যের মায়াজাল বিস্তৃত রয়েছে দৃষ্টিসীমার পরপার পর্যন্ত। এই অপূর্ব জীবন্ত বিস্ময়ের সামনে দাঁড়িয়ে বুক ভরে যাবে স্তম্ভিত উপলব্ধির গভীরতায়। নক্ষত্রলোকের অপরূপ সৌন্দর্যের কাছে, এদের সন্নিবেশ পরিকল্পনার বিরাটত্বের তুলনায় মানুষের নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত মনে হবে নগণ্য, অর্থহীন, বায়বীয় অনুভূতি মাত্র।

মনে হয় আকাশের দিকে তাকালেই লক্ষ লক্ষ তারা আমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু আসলে পৃথিবী গোলাকার বলে একসঙ্গে কেবল আকাশের কতকটা অংশ আমরা দেখতে পাই, আর তাতে খালি চোখে সাড়ে তিন হাজার পর্যন্ত তারা দেখতে পাওয়া সম্ভব।

দূরবীন লাগিয়ে এই সংখ্যাকে অবশ্য অনেকখানিই বাড়িয়ে নেয়া যায়। সাধারণ দূরবীনে দেখা যায় মোটামুটি দেড় লাখ। মাউন্ট উইল্‌সনের একশ ইঞ্চি দূরবীনে প্রায় দেড়শ কোটি। কিন্তু তারও বাইরে আরো অগণিত এমন নক্ষত্র আছে যেগুলোকে কোন যন্ত্র দিয়েই খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্মরণাতীত কাল থেকে নাবিক, পশুপালক, উটচালকরা বিজন সাগরে, বনে-প্রান্তরে নক্ষত্রের নিশানা দেখে দিকনির্ণয় করেছে। তাই প্রাচীন গ্রীকরা, রোমানরা, আরবরা উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোর সুন্দর সুন্দর নামকরণও করেছিল। যেমন, পোলারিস বা ধ্রুবতারা, শ্রবণা (Altair), স্বাতী (Arcturus)—এদের নামকরণে কবিত্বের আভাস পাওয়া যায়। সামান্য একটু অভ্যাসের ফলে আকাশের মানচিত্র দেখে বিশেষ বিশেষ তারার স্থান নির্দেশ করা তেমন কঠিন কিছু নয়।

বিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমি উজ্জ্বলতার হিসেব করে তারাদের ছ'টা ভাগে ভাগ করেছিলেন। খালি চোখে দেখা সবচাইতে অনুজ্জ্বল তারাগুলো ষষ্ঠ শ্রেণীর, তার চাইতে আড়াই গুণ উজ্জ্বল তারাগুলো পড়বে পঞ্চম শ্রেণীতে, এমনি করে সবচেয়ে জ্বলজ্বলে তারায় এলে প্রথম শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে লুব্ধক (Sirius), স্বাতী বাণরাজা (Rigel), সরমা (Procyon) এসব অতি উজ্জ্বল তারা।

বর্ণালীর সাতটা রঙের মতো তারাদেরও রঙের তফাত আছে। কোনটা লাল (যেমন আর্দ্রা), কোনটা হলদে (যেমন মীরা), কোনটা বা নীল (যেমন অভিজিৎ)।

রঙের তফাত হবার কারণ এক একটার উত্তাপের তারতম্য। খানিকটা লোহার তালকে হাপরে গরম করতে আরম্ভ করলে প্রথমে হয় টকটকে লাল, তারপর ধীরে ধীরে হলদে এবং পরে সাদাটে হয়ে ওঠে। তেমনি টকটকে লাল যেসব তারা (যেমন সাত ভাই-এর রোহিনী) তাদের ওপরকার তাপ তিন হাজার সেলসিয়াস ডিগ্রির কাছাকাছি হবে; ক্যাপেলা বা ব্রহ্মহৃদয়ের মতো হলদে তারার উত্তাপ এর দ্বিগুণ। সবচাইতে গরম যেসব তারা, তাদের রঙ হয় নীলাভ-সাদা, যেমন কন্যারাশির চিত্রা নক্ষত্রটির উত্তাপ বিশ হাজার ডিগ্রির কাছাকাছি। দূরবীনের সঙ্গে বৈদ্যুতিক যন্ত্র লাগিয়ে তারার গায়ের তাপমাত্রা সূক্ষ্মভাবে মাপা যায়। যন্ত্রটার নাম বোলোমিটার; এতে কালো প্লাটিনামের পাতে তারার রশ্মি শোষণ করে তা থেকে তাপ মেপে হিসেব বের করা হয়।

আকাশের দিকে তাকালে আপাতত মনে হয় সব তারাই আকারে সমান। কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়। এক একটি তারার আয়তনে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে। ১৯২০ সালে প্রফেসর মাইকেলসন প্রথমে আলোক-রশ্মির অপবর্তন চিত্রের সাহায্যে জটিল অঙ্ক কষে নক্ষত্রের ব্যাস নির্ণয় করেন। তিনি যে তারাটি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন (কালপুরুষের আর্দ্রা) তার ব্যাস বেরোল ৪৪ কোটি কিলোমিটার। কিন্তু এর চেয়ে বহুগুণে বড় তারাও রয়েছে। আলফা হারকিউলিস নামে একটা তারা এত অসম্ভব রকম বড় যে, এটা যদি সূর্যের জায়গায় থাকত, তাহলে এর বাইরের বেড় পৃথিবী ছাড়িয়ে মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথ পর্যন্ত বিস্তৃত হত।

আকাশে হাজার হাজার তারা রয়েছে বলে যে সেগুলো খুব কাছাকাছি তা নয়। একজন জ্যোতির্বিদ যেমন বলেছেনঃ সমগ্র ইউরোপের আকাশে যদি তিনটি বোলতা ছেড়ে দেয়া যায়, তাহলে নক্ষত্রের চাইতে তারা বেশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে থাকবে।

আসলে আমাদের মাথার ওপর যে মহাশূন্য দেখতে পাই, সেটা সত্যি অচিন্ত্যনীয়রকম বিরাট। আমাদের সৌরমণ্ডল তো সূর্য থেকে বাইরের দিকে প্লুটো পর্যন্ত মাত্র ৬৫০ কোটি কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু তারপরেই রয়েছে একটা বিরাট ফাঁকা জায়গা। চল্লিশলক্ষ কোটি কিলোমিটার দূরে আমরা পাই নিকটতম নক্ষত্র আল্‌ফা সেন্টরাই; লুব্ধক্ এর দ্বিগুণ দূরে। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছায় মোটামুটি আট মিনিটে কিন্তু লুব্ধক নক্ষত্র থেকে আলো পৌঁছতে সময় লাগে আটটি বছর।

বিন্দুর মতো যেসব তারা আমরা দেখি, এগুলো আমাদের অপেক্ষাকৃত কাছের দিকে রয়েছে। আরও বহু দূরে সমস্ত আকাশ জুড়ে চক্রাকারে বিস্তৃত রয়েছে আবছা আলোকময় ছায়াপথ অর্থাৎ আমাদের গ্যালাক্সি। প্রায় দশ হাজার কোটি নক্ষত্র এবং অগণিত নীহারিকাপুঞ্জের আলোক সমাবেশেই ছায়াপথের সৃষ্টি। এসব নক্ষত্র এত দূরে যে, এদের পৃথক করে দেখবার উপায় নেই।

স্যার জেমস জীনস্ ছায়াপথকে বলেছেন ঘূর্ণায়মান চাকার মতো, যার কেন্দ্র রয়েছে পৃথিবী থেকে পঞ্চাশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে (আলো চলে প্রতি মিনিটে ১,৮০,০০,০০০ কিলোমিটার, অর্থাৎ এক আলোকবর্ষ হল নয়ের পিঠে বারোটা শূন্য দিলে যত হয়, মোটামুটি তত কিলোমিটার)। সৌরমণ্ডল এই বিরাট চক্রেরই একটি কণা। এর কাছে আমাদের সসাগরা ধরণীর তুলনা হয় শুধু প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর ভাসমান একটি রেণুর সঙ্গেই। কিন্তু ছায়াপথ ছাড়িয়েও বহুদূর পর্যন্ত নক্ষত্রলোক বিস্তৃত রয়েছে। মাউন্ট উইলসনের দূরবীন দিয়েই এমন সব গোলাকার পুঞ্জ নক্ষত্র দেখা গেছে যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে ১৮,০০০ বছরের বেশি সময় লাগে। [১]

এত দূরের নক্ষত্রপুঞ্জের কথা কল্পনা করা শক্ত, কিন্তু তার চাইতেও দূরের 'দ্বীপবিশ্ব' আমাদের কল্পনাশক্তিকে যেন পরাস্ত করে। গভীর শূন্যলোকে এসব গ্যালক্সি তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছে গোলাকার বিশ্বের পরিধির দিকে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হারলো শাপলি আঁক কষে দেখিয়েছেন, এম ৮৭ নীহারিকা থেকে আমাদের কাছে আলো পৌঁছতে আশি লক্ষ বছর সময় নেয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট পালোমার মানমন্দিরে ২০০ ইঞ্চি (৫ মিটার) ব্যাসের দূরবীন বসানো হয়েছে। চাঁদের দিকে এ দূরবীন তাক করার কোন মানে নেই। কারণ চাঁদকে ভালভাবে দেখবার জন্য ছ' থেকে বিশ ইঞ্চির দূরবীনই যথেষ্ট। এ দূরবীনের কাজ হল বিশ্বের দূরতম প্রান্তের নক্ষত্র থেকে আলো সংগ্রহ করা, যাতে আমরা মহাবিশ্বের সুদূর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করতে পারি।

নক্ষত্রগুলোর ভেতরের অবস্থা পারমাণবিক বিস্ফোরণের স্তরে। নক্ষত্রের বস্তুপিণ্ড অবিরত তাপ, আলো এবং বেতার তরঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে। আমাদের সূর্য খুব নগণ্য নক্ষত্র হলেও প্রতি সেকেণ্ডে এর প্রায় সত্তর কোটি টন বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। পদার্থ এবং শক্তি এদের এক থেকে যে অন্যের উৎপত্তি সম্ভব আইনস্টাইনের এই সিদ্ধান্তের ওপরই পরমাণু-শক্তির অফুরন্ত সম্ভাবনার আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

প্রতিটি নক্ষত্র এক একটি বিরাট পারমাণবিক চুল্লি ছাড়া আর কিছু নয়। এর ভেতর প্রচণ্ড তাপে পরমাণুগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ইলেকট্রন আর প্রোটনের আকারে সবসময়েই ছিটকে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তবু ভেতরের চাপ এত বেশি যে, সমস্ত পদার্থ অকল্পনীয়রকম ঘন রূপে রয়েছে; হয়তো এক ঘন সেন্টিমিটার পদার্থের ওজনই কয়েক টন।

আজকাল জ্যোতির্বিদ্যায় প্রায় সব পর্যবেক্ষণই করা হয় ফটোগ্রাফির সাহায্যে। উন্নত ধরনের ফটোগ্রাফির প্লেট ব্যবহার করে[১] দূরবর্তী নক্ষত্রের অতি মৃদু আলোরও ছবি নেয়া সম্ভব হয়। দূরবীন ও ক্যামেরার সংযোগে এমন সব পরিবর্তন লক্ষ্য করা সম্ভব হচ্ছে যা শুধু চোখে কখনোই সম্ভব হত না। অঙ্ক কষে প্লুটোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানা গেলেও হাজার হাজার ফটোগ্রাফির প্লেট খরচ করে পনের বছর পরে এই গ্রহটিকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল।

নক্ষত্রলোকের এই যে লীলা-বৈচিত্র্য, কিসের জন্য এসব? কোথায়ই বা এর পরিণতি? —স্যার জেমস জীন্‌স এর একটা জবাব দিয়েছেনঃ এই বিরাট বিশ্বের পেছনে একটা বিরাট গাণিতিক শৃঙ্খলা রয়েছে। ... বিকিরণের ফলে নক্ষত্রের শক্তি লয় পাচ্ছে। অবশেষে সমস্ত শক্তিপুঞ্জের একদিন বিনাশ ঘটবে।

জীন্‌স-এর হিসেব মতো বিশ্বের মৃত্যু একদিন অনিবার্য ; কিন্তু সে ধ্বংসের দিন আসতে এখনও বহু কোটি বছর দেরি আছে। ততদিন পর্যন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে এর অনন্ত রহস্যের মুখোমুখি আমরা কেবল স্তম্ভিত বিস্ময়ে অবাক হতে পারি।

[১৩৪৬/১৯৪৯]

---

[১]এরপর মাউন্ট পালোমার ও অন্যান্য দূরবীন দিয়ে কয়েকশ কোটি আলোক-বছর দূরের নক্ষত্রের হদিস পাওয়া গেছে।

আন্তর্জাতিক ভূ-বর্ষ

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বু রাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী....
—রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঐকতান' কবিতায় আক্ষেপ করে বলেছিলেনঃ 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—'। পৃথিবীর কথা সত্যি যে আমরা আজও কত কম জানি তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। নগর রাজধানীর বিস্তারিত বিবরণ বাদ দেয়া যাক, যে পৃথিবীর ওপরে আমরা বাস করছি তার সত্যিকার চেহারাটিই কি আজো আমরা ভাল করে জানি?

অথচ পৃথিবীর কথাই আমাদের সব চাইতে ভাল করে জানা দরকার। কেননা পৃথিবীর চারদিকের অবস্থা আমাদের সমগ্র জীবনের ওপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে আছে।

আজকের এই বিশ শতকে পৌঁছে একদিকে যেমন আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত পদসঞ্চার ঘটেছে, তেমনি বিজ্ঞানীর দুঃসাহসী অভিযান ঘোষিত হয়েছে পৃথিবীর দিকে দিকে। পৃথিবীর সমগ্র ভূভাগ মানুষ চষে বেড়িয়েছে, সন্ধানীরা নেমেছে গভীর সমুদ্রের তলায়, বেলুনে চেপে বিজ্ঞানী-মানুষ উঠেছে সুউচ্চ আকাশে, বিজ্ঞানীর প্রয়োগশালায় চলেছে দিবা-রাত্রির সাধনা। কিন্তু তবু পৃথিবীর সব রহস্যের আজো কিনারা হয় নি।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, বহু শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে মহাদেশগুলোর স্থান পরিবর্তন ঘটেছে। একথা কি সত্যি? পৃথিবীর তুষারঢাকা এলাকা কমে যাওয়া থেকে মনে হয় পৃথিবী দিন দিন গরম হয়ে উঠছে। এটা সত্যি হলে তার কারণ কি? পৃথিবীকে মনে হয় যেন বিরাট একটা চুম্বক। তার এই চুম্বকত্বের কী রহস্য? পৃথিবীর ওপরে বহু কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত যে হাওয়ার চাঁদোয়া তার মধ্যেই রয়েছে দুনিয়ার সব দেশের আবহাওয়ার চাবিকাঠি। এই আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার কি কোন উপায় বের করা যায় না? পৃথিবীর আবহাওয়ার ওপরে দক্ষিণ-মেরুর বা সূর্যের প্রভাবটা ঠিক কি ধরনের? উত্তর বা দক্ষিণ মেরুতে মাঝে মাঝে যে মেরু-জ্যোতি দেখতে পাওয়া যায় তা কি করে তৈরি হয়? কস্‌মিক রশ্মিরই বা উৎপত্তির রহস্য কি?—এমনি আরো অজস্র, অসংখ্য প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞানীদের জানা প্রয়োজন।

অস্পষ্ট জ্ঞান নিয়ে এগোতে গেলে বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রেই পদে পদে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অথচ সমস্যাগুলো এমন যে, কোন একটি দেশের বিজ্ঞানীদের পক্ষেই এগুলোর পুরোপরি বা সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব নয়। এসব রহস্য ভেদ করতে হলে চাই সারা দুনিয়া জুড়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান, আর তার জন্য প্রয়োজন সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং সংযুক্ত উদ্যম।

দুনিয়ার ৬৪টি দেশের সাত হাজারেরও বেশি বিজ্ঞানী এই উদ্দেশ্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের সম্মিলিত উদ্যোগে ১৯৫৭-এর পয়লা জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পালন করা হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক ভূ-বর্ষ' হিসেবে (যদিও সময়টা আসলে আঠার মাস)। এই আঠার মাস ধরে একটি আন্তর্জাতিক কমিটির তত্ত্বাবধানে ৫৬টি দেশের বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি অনুযায়ী ব্যাপক গবেষণা চালাবেন। আর তাঁদের এই গবেষণার ফলাফল হবে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদেরই সাধারণ সম্পত্তি।

প্রশ্ন হতে পারে, ১৯৫৭-৫৮ সালেই হঠাৎ সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের এমন বিরাট আকারের ঐতিহাসিক সহযোগিতা কি করে সম্ভব হল? — ব্যাপারটার সামান্য একটু ইতিহাস আছে।

১৮৮২-৮৩ সালে ছোট আকারে একটি মেরুবর্ষ পালন করা হয়েছিল। উত্তর মেরুতে অভিযান চালানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। তার পঞ্চাশ বছর পর ১৯৩২-৩৩ সালে বারটি দেশের বিজ্ঞানীরা মিলে দ্বিতীয় মেরুবর্ষ পালন করেন। তখন মোটামুটি ধারণা করা হয় যে, আবার পঞ্চাশ বছর পর আরেক মেরুবর্ষ পালন করা হবে। কিন্তু বছর পনের যেতে না যেতেই দেখা গেল বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতকগুলো মৌলিক তথ্য এমন জরুরী হয়ে উঠেছে যে, পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মিলিত উদ্যোগে প্রচুর তথ্য আহরণ করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন ১৯৫৭-৫৮ সালে শুভ যোগ রয়েছে। সাধারণত এগার বছর পর পর সূর্যের গায়ে সৌর-স্ফীতি এবং কলঙ্কের প্রাচুর্য দেখা দেয় আর পৃথিবীর ওপর নানাভাবে তার প্রভাব পড়ে। হিসেব মতো ১৯৫৭-৫৮ সালে আবার এমনি সৌর তৎপরতা দেখা দেবার কথা, আর তখনই হবে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে অনেক অজানা রহস্যের তত্ত্ব-সন্ধানের সব চাইতে উপযুক্ত সময়। কাজেই ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানীদের এক সভায় স্থির করা হল, দ্বিতীয় মেরুবর্ষের পঁচিশ বছর পরেই অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ সালে এমনি 'তৃতীয় বর্ষ' উদযাপন করা হবে; আর এবারে অভিযান চলবে শুধু উত্তর মেরুর রহস্য উদ্ধারের জন্য নয়, সারা পৃথিবীর রহস্য-উদঘাটনে।

ভূ-বর্ষ যদিও সরকারীভাবে ১৯৫৭ সালের ১ জুলাই থেকে শুরু হবার কথা, কিন্তু প্রস্তুতির কাজ চলতে থাকল ১৯৫৪ সাল থেকেই। এবছরই মার্কিন বিজ্ঞানীরা দক্ষিণ মেরুতে অগ্রগামী অভিযাত্রী দল পাঠালেন। সোভিয়েত ও ব্রটিশ অভিযাত্রীদলও রওনা হলেন উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে। প্রধানত যে তেরটি বিভিন্ন দিকে ভূ-বর্ষের অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজ চালানো হবে তার সব দিকেরই উদ্যোগ আয়োজন চলতে

লাগল ১৯৫৪, ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সাল ধরে। দক্ষিণ মেরুর গবেষণা এই তেরটি বিভিন্ন দিকের একটি মাত্র।

কিন্তু দক্ষিণ মেরুর দিকেই বিজ্ঞানীদের প্রথম দৃষ্টি পড়ল কেন? দক্ষিণ মেরু মহাদেশ হচ্ছে একটি বিশাল স্থলভাগ। দেড় কোটি বর্গকিলোমিটার অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একত্র করলে যত বড় হবে প্রায় তত বড়। অথচ এ মহাদেশটির কথাই পৃথিবীর আর সব মহাদেশের তুলনায় আমরা সবচাইতে কম জানি।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন যে, দক্ষিণ মেরুতে সবচাইতে সমৃদ্ধ লোহা ও কয়লার খনির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়াও এখানে রয়েছে তামা, ইউরেনিয়াম, সোনা ইত্যাদি বহু দুর্মূল্য ধাতু। তবু এসব খনিজের লোভই দক্ষিণ মেরুর সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের আগ্রহের সবচেয়ে বড় কারণ নয়।

দক্ষিণ মেরু হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে বড় শীতল এলাকা। সারা পৃথিবীতে যত হিমবাহজাত বরফ আছে তার শতকরা ৮৬ ভাগই জমে রয়েছে দক্ষিণ মেরুতে– এমন বিপুল এর পরিমাণ যে, এই বরফ সবটা যদি গলে যায় তাহলে সারা পৃথিবীতে সমুদ্রের উচ্চতা ফেঁপে উঠবে পঞ্চাশ থেকে ষাট মিটার। বিজ্ঞানীদের এটা জানা আছে যে, দক্ষিণ মেরুর শীতল হাওয়ার সঙ্গে বিষুব অঞ্চলের উষ্ণ হাওয়ার নিরন্তর আদান–প্রদান চলছে এবং তার ফলে দক্ষিণ মেরুর এই বিপুল বরফের পুঞ্জ শীতাতপের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সমগ্র পৃথিবীর জলবায়ুর ওপর একটা বিরাট প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। অথচ জলবায়ুর ওপর দক্ষিণ মেরুর বিশাল প্রভাব সম্বন্ধে প্রায় কিছুই মানুষের জানা নেই। তাছাড়া আকাশের বহু রহস্য অনুসন্ধান করার ব্যাপারে দক্ষিণ মেরুর কতকগুলো বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে প্রাণীদেহের নিঃশ্বাস–নিঃসৃত কারবন ডাই–অকসাইড গ্যাস আবহাওয়ার মধ্যে একটা অদৃশ্য জালের সৃষ্টি করে, তার ভেতর দিয়ে বাইরের সব রশ্মি পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে না। দক্ষিণ–মেরুতে কোন প্রাণীর বাস নেই, তাই সেখানকার আবহাওয়া প্রায় কারবন ডাই–অকসাইড শূন্য। তার ফলে দক্ষিণ–মেরুর আকাশে এমন কতকগুলো গবেষণা করা সম্ভব যা পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভব নয়।

দক্ষিণ মেরুতে যে গবেষণা চালানো হবে তাতে বারটি দেশের বিজ্ঞানীরা অংশ গ্রহণ করবেন। আর এজন্য সেখানে ৬০টি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। তাতে কাজ করবে প্রায় ৫,০০০ জন লোক, ৫০টি জাহাজ এবং ৫০টি বিমান।

দক্ষিণ মেরুর গবেষণা থেকে মাধ্যাকর্ষণ এবং পৃথিবীর চুম্বক–ক্ষেত্রের রহস্যও উদ্ধার করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মাধ্যাকর্ষের শক্তি বিভিন্ন। এথেকে বোঝা যায় পৃথিবী আদর্শ বর্তুলাকার নয়। কিন্তু যথেষ্ট তথ্যের অভাবে পৃথিবীর সত্যিকার আকার কী, এপ্রশ্নের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নি।

জানা গিয়েছে যে, পৃথিবীর আচরণ বিশাল একটি চুম্বকের মতো। সাধারণ যে–কোন চুম্বকদণ্ডের মতোই তার উত্তর ও দক্ষিণ দু'টি চুম্বক প্রান্ত রয়েছে। পৃথিবীর এই চুম্বকশক্তির জন্যই দিক–শলাকা সব সময় উত্তর–দক্ষিণে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কিন্তু

পৃথিবীর এই চুম্বকত্বের কিভাবে যে উৎপত্তি তা বিজ্ঞানীদের নির্দিষ্ট করে জানা নেই। কখনো কখনো পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রে আকস্মিক ব্যতিক্রম দেখা দেয়, তারও সঠিক কারণ এখনও অজ্ঞাত। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ চুম্বক-মেরু এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই, ক্রমাগত ধীরে ধীরে স্থান পরিবর্তন করে চলেছে। গত কয়েক হাজার বছরে উত্তর চুম্বক-মেরু যে যথেষ্ট স্থান পরিবর্তন করেছে এ-বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মনে কোন সংশয় নেই। মেরুর এই স্থান পরিবর্তনের কারণ কি, তাও এখনও জানা যায় নি।

মেরুর আকাশ মাঝে মাঝে হঠাৎ উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। উত্তর মেরুতে একে 'অরোরা বোরিয়ালিস' এবং দক্ষিণ মেরুতে 'অরোরা অস্ট্রালিস' বলা হয়। কখনো এই মেরু-জোতির আর্বিভাবের ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেতার যোগাযোগের বিঘ্ন ঘটে। মেরু-জ্যোতি ছাড়াও সারা পৃথিবীতে রাত্রির আবহাওয়ায় এক রকম মৃদু বায়ুদীপ্তি (air glow) দেখতে পাওয়া যায়। এই মেরু-জ্যোতি বা বায়ুদীপ্তির সঠিক কারণ বিজ্ঞানীদের এখনো জানা নেই। তবে তাঁদের অনুমান, বাইরের মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে শক্তিশালী বিদ্যুৎকণিকার ব্যাপক আবির্ভাব ঘটলে সেগুলো পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণে দুই মেরুতে সঞ্চিত হয়। বায়ুকণার ওপর এসব বিদ্যুৎকণার আঘাতের ফলেই মেরু-জ্যোতির উৎপত্তি। ভূ-বর্ষে উত্তর মেরু-জ্যোতি এবং দক্ষিণ মেরু-জ্যোতির আবির্ভাবকালের মধ্যে সমন্বয় নির্ণয়ের চেষ্টা হবে।

আন্তর্জাতিক ভূ-বর্ষে বিজ্ঞানীদের সবচাইতে বেশি নজর পড়বে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের দিকে। তার কারণ পৃথিবীর সব দেশে জলবায়ুর রূপান্তর ঘটে এই বায়ুমন্ডলেই। আর বায়ুমণ্ডল হচ্ছে একটি অবিচ্ছিন্ন সত্তা, তাই পৃথিবীর কোন দেশের জলবায়ুকেই বিচ্ছিন্ন করে দেখবার উপায় নেই।

জলবায়ুর বেশির ভাগ পরিবর্তনের মূলে রয়েছে আবার সূর্যের প্রভাব। বিভিন্ন দেশে তাপের তারতম্য, দেশে দেশে ঋতুভেদে জলবায়ুর পরিবর্তন — এককথায় পারিপার্শ্বিক যেসব প্রাকৃতিক অবস্থা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে তার বহুকিছুর মূলেই রয়েছে সূর্য। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর চুম্বকশক্তি, মেরুজ্যোতি, দূরপাল্লার যোগাযোগ এসবের মধ্যেও রয়েছে সূর্যেরই আধিপত্য।

এগার বছর পরপর সূর্যের ওপর ঝড়ের প্রাচুর্য দেখা দেয়। তখন তার গায়ে ঝড়ের এলাকাগুলোতে কালো কালো দাগ ফুটে ওঠে। এক একটা প্রচণ্ড আক্ষেপে সৌরগ্যাসের স্ফীতি বিপুল বেগে কয়েক লক্ষ কিলোমিটার উঁচুতে লাফিয়ে ওঠে। আর তার ফলে পৃথিবীর ওপরেও অদৃশ্য শক্তিশালী দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগে বিঘ্ন দেখা দেয়, মেরুর আকাশে মেরুজ্যোতি ঝলকে ওঠে, পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটে, পৃথিবীর ওপর কসমিক রশ্মির আক্রমণও বেড়ে যায়।

অথচ এসব ব্যাপারের সঠিক প্রকৃতি এখনো পুরোপুরি বোঝা যায় না। এধরনের ঘটনা ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য সারা পৃথিবীতে অসংখ্য নিরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন

করা হচ্ছে। এসব কেন্দ্রের গবেষণা থেকে সৌর তৎপরতার সঙ্গে পৃথিবীর ঘটনাবলির যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক নিরূপণের চেষ্টা চলবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে এক হাজারেরও বেশি আবহবিদ ভূ-বর্ষের পর্যবেক্ষণে অংশ গ্রহণ করবেন। এতদিন পর্যন্ত আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য যন্ত্রপাতিসহ যেসব বেলুন ওড়ানো হত সেগুলো ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ওপরে উঠত; এবার এমন বেলুন তৈরি হয়েছে যা হাওয়ার ৩০ কিলোমিটার ওপরে উঠতে পারে। সাধারণ আবহাওয়া বেলুন এর চেয়ে বেশি ওপরে ওঠানো যায় না। তবে রকেটে চাপিয়ে আর এক ধরনের বেলুন পাঠানো হবে যেগুলো উঠবে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত।

আবহাওয়ার এসব পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি?— বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, সারা বছরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বায়ু প্রবাহের ফলে যে পরিমাণ শক্তির সৃষ্টি হয় তা ৭০ লক্ষ পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণের সমান। আবহবিদ বিজ্ঞানীদের চেষ্টা হবে এই প্রচণ্ড শক্তিধর বায়ুমন্ডলের নিয়ম-কানুন বোঝার চেষ্টা করা। তাঁদের এসব গবেষণার ফলে হয়তো আবহাওয়ার দূরপাল্লার পরিবর্তন সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

পৃথিবীর ওপকার বায়ুমণ্ডলকে মোটামুটি চারটে স্তরে ভাগ করা যায়ঃ

১. সমুদ্র সমতল থেকে চৌদ্দ-পনের কিলোমিটার উঁচু পর্যন্ত ঘন বায়ুর স্তর বা ট্রপোস্ফিয়ার।

২. তারপর ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত হালকা বায়ুর স্তর বা স্ট্রাটোস্ফিয়ার।

৩. ৮০ থেকে ৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত কয়েকটি বৈদ্যুতিক স্তর যাদের একসঙ্গে করে বলা হয় আয়নমণ্ডল বা আয়নোস্ফিয়ার ।

৪. তার বাইরে একটি বহুদূর বিস্তৃত বহিঃস্তর বা এক্সোস্ফিয়ার।

এদের মধ্যে নানা করণে আয়নমণ্ডলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আয়নমণ্ডল যেন পৃথিবীর চারপাশে একটি বৈদ্যুতিক আবেশের পরদা। হ্রস্বতরঙ্গের ঢেউ এই স্তরে ধাক্কা খেয়ে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে বলেই পৃথিবীর এমাথা থেকে ওমাথায় বেতারে সংবাদ আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, সূর্য থেকে অদৃশ্য শক্তিশালী রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত করার ফলেই আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি হয়; আর তাই সৌরস্ফীতির সময় যখন সূর্য থেকে আকস্মিক প্রবল রশ্মি বিচ্ছুরণ ঘটে তখন আয়নমণ্ডলেও গুরুতর বিপর্যয় দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ওপর দূর পাল্লার বেতার যোগাযোগ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু সত্যি কি সূর্যের রশ্মি থেকেই আয়নমন্ডলের সৃষ্টি? যদি তাই হবে তাহলে শীতকালে যখন কয়েক মাস ধরে দক্ষিণ মেরুতে মোটেই সূর্যের আলো পড়ে না, তখন সেখানকার আকাশে আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি হয় কি করে? তাহলে কি কি কারণে এবং কি কি অবস্থায় আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি হয় তা কি এখনো পুরাপুরি জানা যায় নি?

এ-ব্যাপারে অবশ্য একটা গুরুতর রকমের অসুবিধেও আছে। যে সব হ্রস্বতরঙ্গ রশ্মির আঘাতে বায়ুমণ্ডলের ৮০ থেকে ৪০০ কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যুতের আবেশ ঘটে তার প্রায় কিছুই বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আমাদের কাছে পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। কাজেই ভূমির ওপর থেকে পরীক্ষা করে এদের প্রকৃতি সম্পর্কে জানবার কোন নির্ভরযোগ্য উপায় নেই। এদের প্রকৃতি বুঝতে হলে পরীক্ষার যন্ত্রপাতি পাঠাতে হবে আকাশের অনেক ওপরে।

তাই এবার দুনিয়ার নানা জায়গা থেকে রকেটে করে যন্ত্রপাতি পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে অনেক উঁচু আকাশে। শুধু এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই প্রায় ছ'শ রকেট ছোঁড়া হবে। তার কোন কোনটি উঠবে ৩০০ কিলোমিটার। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেও এমনি রকেট ছোঁড়া হবে একশ'র ওপরে।

এমনি আরেক রহস্য বিশ শতকের প্রায় শুরু থেকে বিজ্ঞানীদের বিব্রত করে রেখেছে। সে হচ্ছে কসমিক রশ্মির রহস্য। এটা জানা গেছে, দিন-রাত পৃথিবীর চতুর্দিকে বর্ষিত হচ্ছে অজস্র শক্তিশালী মহাজাগতিক কণিকা; মানুষের পরমাণু চূর্ণকরা যন্ত্রে তৈরি যে-কোন কণিকার শক্তিকে হার মানায় এর তেজ। কিন্তু কোথা থেকে এদের উৎপত্তি তার পুরো রহস্য আজো আমাদের অজানা। সৌরস্ফীতির সময় কস্‌মিক রশ্মির বর্ষণ আশ্চর্যরকমভাবে বেড়ে ওঠে, তাতে মনে হয় এদের অন্তত একটা অংশের উৎপত্তি সূর্য থেকে, বাকি অংশের উৎপত্তি মহাকাশের আর কোথাও হওয়া বিচিত্র নয়।

এসব গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ভূ-বর্ষের সব চাইতে রোমাঞ্চকর দিক বোধ হয় পৃথিবীর বাইরে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো। এই বছরের শেষ দিকে বা সামনের বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১২টি এবং সোভিয়েত রাশিয়া থেকে ১২টি গোলক শূন্যে ছুঁড়ে দেয়া হবে। আশা করা যাচ্ছে, সেগুলো পৃথিবী থেকে এত দূরে ঠেলে দেয়া যাবে যাতে তারা পৃথিবীর ওপর হুমড়ি খেয়ে না পড়ে পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের মতো ঘুরপাক খায়। গোলকে নানা রকম জটিল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বসানো থাকবে। এসব যন্ত্র তাদের বিভিন্ন অবস্থানে তাপ, বায়ুর ঘনত্ব, পৃথিবীর আকর্ষণ, কস্‌মিক রশ্মির প্রকৃতি, সূর্যরশ্মির প্রকৃতি এমনি বহু বিষয়ে তথ্য আহরণ করে বেতার যোগে পৃথিবীতে পাঠাবে।

গোলাকগুলো আকারে হবে খুবই ছোট—মাত্র ৫০ সেন্টিমিটার ব্যাসের—যন্ত্রপাতিসহ ওজন হবে প্রায় দশ কেজি (সোভিয়েত গোলকগুলো ৫০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে)। তিনটে রকেট একসঙ্গে জুড়ে এদের শূন্যে ছোঁড়া হবে। প্রথম ধাপে উঠবে এরা ৫৮ কিলোমিটার, দ্বিতীয় ধাপে ২২০ কিলোমিটার, তৃতীয় ধাপে ৪০০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার। উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারপাশে ঘোরার সময় পৃথিবীর কাছে এলে এদের দূরত্ব হবে ১৫০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার, দূরে সরে গেলে হবে ১৩০০ থেকে ২৫০০ কিলোমিটার। এত দূর থেকে এদের খালি চোখে দেখতে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই, তবে বাইনোকুলার বা দূরবীন দিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে। এছাড়া তখন এদের বেগ থাকবে ঘন্টার প্রায় ২৯,০০০ কিলোমিটার, অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৮ কিলোমিটার। এই বেগে ৯০ মিনিটে এরা একবার পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে আসতে পারে, অর্থাৎ দিনে ১৬

বার পৃথিবীকে পাক দেওয়া হয়ে যাবে। শূন্যলোকের এসব ব্যাপক পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন রহস্যই হয়তো উদঘাটন করতে পারবেন।

তাই বলে বিজ্ঞানীরা শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে নেই, স্থল ও সমুদ্রের দিকেও তাঁদের সমান দৃষ্টি রয়েছে। পৃথিবীর ভেতরকার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে অনেক রহস্যই আজো বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা। তাই হঠাৎ কোথায় নতুন স্তর বিপর্যয় ঘটে ভূমিকম্প দেখা দেবে সে সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় কিছুই বলতে পারেন না। ভূমিকম্পের ঢেউয়ের চলাচল থেকে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি জানা যায়। ভূ-বর্ষে বিজ্ঞানীরা শুধু প্রাকৃতিক ভূমিকম্পের জন্য অপেক্ষা করে না থেকে মাটির নিচে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছোট ছোট কৃত্রিম ভূমিকম্প সৃষ্টি করে তাঁদের পরীক্ষা চালাবেন। এজন্য প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে ২০টি নতুন ভূকম্প-গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

তেমনি, পৃথিবীর শতকরা ৭১ ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে যে সমুদ্র তার শুধু পরিতল সম্বন্ধেই বিজ্ঞানীদের জানা আছে। গভীর সমুদ্রের বিভিন্ন স্রোতের কথা আজও বিশেষ কিছু জানা নেই। অথচ গভীর সমুদ্রের এসব জলস্রোতের সঙ্গে পৃথিবীর জলবায়ুর একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে। সমুদ্রে মাছের পরিমাণও অনেকটা নির্ভর করে গভীর সমুদ্রের প্রকৃতির ওপরে। সেজন্য এদিকেও বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করেছেন।

এককথায়, আধুনিক সভ্যতার সকল সম্পদ এবং শাস্ত্র নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজ স্থলে-জলে-আকাশে আমাদের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির রহস্য উদ্ধারের এক বিপুল অভিযানে আত্মনিয়োগ করেছেন। সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের এত বড় অনুসন্ধান আর কখনো পরিচালিত হয় নি। বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে এই দেড় বছরে যে পরিমাণ গবেষণার কাজ চালানো হবে সাধারণ অবস্থায় তা করতে বিশ বছর সময় লাগত। আর এই আয়োজনে খরচ পড়বে অন্তত ২৫০ কোটি টাকা।

কিন্তু এসব গবেষণার ফলে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে জ্ঞানের ভান্ডার সঞ্চিত হবে তার তুলনায় এই ব্যয়ের অঙ্ক অতি তুচ্ছ। এই ব্যাপক আয়োজন থেকে কি ধরনের ফলাফল পাওয়া যাবে ? কোন একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে তাঁর নবতম আবিষ্কারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এ-ধরনের প্রশ্ন করা হলে তিনি তার জবাবে বলেছিলেন, একটি নবজাত শিশুর কাছে লোকে কী প্রত্যাশা করে? সীমাহীন সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তার ভবিষ্যতের মধ্যে।

সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের নিয়ে আজ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যে শুভ পদক্ষেপ ঘটল তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে।

[১৩৬৪/১৯৫৭]

পরমাণু থেকে শক্তি

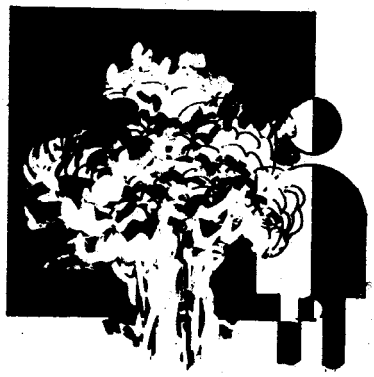

পরমাণু-শক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার

আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি হচ্ছে পরমাণু-বোমা। এর মূলে রয়েছে যে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস সন্ধান, তার প্রতি কৌতূহল তাই সর্বজনীন। পরমাণু-বোমা আবিষ্কারের ফলে সমগ্র সভ্য জগৎ আজ মানব জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও নিয়ন্ত্রণের ওপরই নির্ভর করছে—মানুষ তার বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ দানকে নিজের ধ্বংস-সাধনে নিয়োজিত করবে, না মানব-সভ্যতার কল্যাণে ব্যবহার করবে। ভয়ঙ্কর পরমাণুর শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে ব্যবহার করবার দায়িত্ব আজ মানুষের ওপর পড়েছে।

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট। 'এনোলা গে' নামে মার্কিন বি-২৯ সুপার-ফোরটেস্ বিমান থেকে জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপর একটি পরমাণু-বোমা ফেলা হল। নিমেষের মধ্যে শহরটি হয়ে গেল নিশ্চিহ্ন—চারদিকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়িঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। মানুষ মারা গেল একসঙ্গে প্রায় এক লক্ষ; আবার যারা সঙ্গেই সঙ্গেই মরল না, অদৃশ্য পরমাণু-শক্তির প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই তাদের জীবনী-শক্তি হ্রাস পেল—দেহের শ্বেত রক্তকণিকার প্রায় শতকরা ৮৬ ভাগই নষ্ট হয়ে গেল; তারপর তারাও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। নাগাসাকি শহরের ওপর ফাটল দ্বিতীয় বোমা; এর ধ্বংসকার্য হল আরও ব্যাপক, আরও মারাত্মক। ধ্বংসের বিবরণ পড়ে সমগ্র সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হল।

এর অল্পদিন পরই ঘোষণা করা হল পরমাণু-বোমা নির্মাণ নিয়ে গবেষণা করার জন্য জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান (Otto Hahn)-কে রসায়নশাস্ত্রে ১৯৪৪ সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

মানুষ চিরদিন প্রকৃতি থেকে তার ব্যবহারের জন্য শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করে এসেছে। শক্তি উৎপাদন প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানের প্রথম বড় দান হচ্ছে বাষ্পীয় শক্তি। উনিশ শতকে এল ফ্যারাডের আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজ্ঞানের প্রচন্ডতম শক্তি—পরমাণুর শক্তি; বিদ্যুতের যুগের পরে পরমাণুর যুগ আসবে কিনা তাইবা কে বলতে পারে।

পরমাণু সম্বন্ধে মানুষের ধারণা খুবই প্রাচীন। এমনকি ৩৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (Democritus) তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন, "এক টুকরো পাথর অতি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণিকার সমষ্টি।" তিনিই এদের নাম দিয়েছিলেন পরমাণু বা 'অ্যাটম'— যাকে আর ভাঙ্গা যায় না। ইউরোপের সুদীর্ঘ অন্ধকার যুগে বা রেনেসাঁর যুগেও এবিষয়ে আর অনুশীলন হয় নি। তখনকার দিনের রসায়নবিদরা সাধারণ বস্তু থেকে সোনা তৈরি চেষ্টায় বিভোর ছিলেন।

আঠার শতকের শেষভাগ থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত। উনিশ শতকে নানা নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছিল। এসময়ে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন্ ডাল্টন (John Dalton) পরমাণু সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

পৃথিবীর সব কিছু কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থমাত্রই মোট বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। এই বিরানব্বইটি ছাড়া আর সবই যৌগিক পদার্থ। পদার্থের শেষ অবিভাজ্য পরিণতি হচ্ছে অণু ও পরমাণু। যৌগিক পদার্থের শেষ পরিণতি হল অণু (molecule) আর মৌলিক পদার্থের শেষ পরিণতি পরমাণু (atom)। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর ভর (mass) বিভিন্ন। সবচেয়ে হাল্কা হাইড্রোজেন পরমাণুকে একক ধরে অন্য সব পরমাণুর ভর বের করা হয়েছে।[১] পদার্থের পরমাণুগুলো পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে, আবার পরমাণুর সংযোগেই নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এসব ছিল মনীষী ডাল্টনের পরমাণবিক সূত্রের মূল তত্ত্ব।

ক্রমে ক্রমে নতুন তথ্যের অবিষ্কারে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে মতের পরিবর্তন ঘটল। এই শতাব্দীরই শেষভাগে স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স্ এবং স্যার জে. জে. টম্সন্ পরীক্ষায় পেলেন সকল পরমাণুর একটা সাধারণ উপাদান—ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন কণিকা; তাঁরা আরও দেখালেন যে, এগুলো ওজনে হাইড্রোজেন পরমাণুর ১৮৪৫ ভাগের একভাগ মাত্র। এই সময়ে জার্মান বিজ্ঞানী ভিলহেলম্ কন্রাড রন্ট্গেন (Wilhelm Konrad Rontgen) বিস্ময়কর রঞ্জন-রশ্মি বা এক্সরে আবিষ্কার (১৮৯৫ খ্রিঃ) করলেন।

এদিকে গবেষণা করতে গিয়ে বছরখানেক পর প্যারিতে আঁরি বেকেরেল (Henri Becquerel) নামে একজন বিজ্ঞানী দেখলেন ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম থেকে আপনা আপনি এক রকম রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। অল্পদিন পরেই ক্যুরি-দম্পতি মারি ও ফ্রেডারিক রেডিয়ামেরও এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা জানতে পেলেন। এধরনের যেসব পদার্থ নিজেরা তেজ বিকীর্ণ করে তাদের নাম দেওয়া হল তেজস্ক্রিয় (radioactive)। দেখা গেল, ধাতুগুলো রশ্মি বিকিরণ করতে করতে তাদের পরমাণুতে ভাঙ্গন ধরে, যার ফলে তারা কম পারমাণবিক ভরের ধাতুতে পরিণত হয়। যেমন, ইউরেনিয়াম ২৩৮ থেকে রেডিয়াম ২২৬ এবং তা থেকে রশ্মি বিকীর্ণ হতে হতে বহু হাজার বছর পরে হয় সীসা ২০৭। ধাতুর এই তেজস্ক্রিয় শক্তির কথা জানবার পর থেকেই মানুষের মনে সম্ভাবনা জাগল পরমাণুর শক্তিকে মানুষের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

রেডিয়াম অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বলে বিজ্ঞানী মহলে চেষ্টা চলতে লাগল অন্য কোন সহজপ্রাপ্য ধাতুকে তেজস্ক্রিয় করে রেডিয়ামের পরিবর্তে কাজে লাগান সম্ভব কিনা। সর্বপ্রথম পদার্থের রূপান্তর সাধন করতে সক্ষম হলেন ইংরেজ বিজ্ঞানী (লর্ড) রাদারফোর্ড

[১] আদতে আজকাল আদর্শ ধরা হয় কারবন ১২ পরমাণুকে। সে-অনুযায়ী হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর দাঁড়ায় ১.০০৮।

(Rutherford)। ১৯১১ সালে তিনি পরমাণুর কেন্দ্র আবিষ্কার করলেন এবং সিদ্ধান্ত করলেন, যে-কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কোষ ভেঙ্গে অন্য ধরনের মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করা সম্ভব। ১৯১৯ সালে তিনি এ ধারণার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করলেন, নাইট্রোজেনের পরমাণু-কেন্দ্রে পরিবর্তন এনে অকসিজেন পরমাণু উৎপন্ন করে। ১৯৩৪ সালে ক্যুরি-জামাতা জোলিয়ো-র চেষ্টায় বোরন, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামকে আল্‌ফা কণা দিয়ে আঘাত করে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় ধাতু উৎপন্ন করা সম্ভব হল।

'পরমাণু অবিভাজ্য'-এ তত্ত্ব এরপর আর টিকল না। রাদারফোর্ড ও ডেনিশ বিজ্ঞানী নীল্‌স্ বোর (Niels Bohr)-এর গবেষণায় পরমাণুর গড়ন সম্বন্ধে নতুন তথ্য উদঘাটিত হল। তাঁরা প্রমাণ করলেন, পরমাণুর অভ্যন্তরে কেন্দ্রক বা পরমাণু-বীজ (atomic nucleus)-এর চতুর্দিকে বৃত্তাকারে অতি দ্রুত পরিক্রমণ করছে কতকগুলো ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত কণিকা ইলেকট্রন বা বিদ্যুতিন। ভর এবং আয়তন হিসেবে ইলেকট্রনগুলো নগণ্য। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ধন-কণিকা বা প্রোটন। সবচেয়ে হালকা হাইড্রোজেন পরমাণুতে (ভর ১৭ x ১০$^{-২৬}$ গ্রাম) আছে একটি প্রোটন এবং সবচেয়ে ভারি ইউরেনিয়াম পরমাণুতে আছে ৯২টি প্রোটন। পরমাণুতে প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা সব সময় সমান থাকায় পদার্থের তড়িৎসাম্য রক্ষা হয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে চ্যাড্‌উইক (Chadwick) পরমাণু -কেন্দ্রে এমন একটি বস্তুর সন্ধান পেলেন যার ভর প্রোটনের সমান, কিন্তু তাতে কোন তড়িৎশক্তি নেই। সিদ্ধান্ত হল, এই নিস্তড়িৎ কণিকা বা নিউট্রনে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের দু'রকম তড়িৎ খুব ঘন-সন্নিবদ্ধ হয়ে আছে — তাই এই কণিকা নিরপেক্ষ।

কোন পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রের প্রোটন-সংখ্যাকে তার পরমাণু-সংখ্যা (atomic number) বলা হয়। দেখা যায় যে, মৌলিক পদার্থগুলোর পরমাণু-সংখ্যা (অর্থাৎ প্রোটনসংখ্যা) এক এক করে বেড়ে যেতে থাকে; এভাবে প্রোটনসংখ্যা মৌলিক পদার্থের তালিকায় পদার্থের স্থান নির্দেশ করে। এই ক্রম অনুসারে বিজ্ঞানী মোস্‌লে (Moseley) নানা পদার্থকে সাজালেন। যেমন, হাইড্রোজেনের স্থান ১, কয়লার ৬, লোহার ২৬, সীসা ৮২, এবং ইউরেনিয়াম সর্বশেষ ৯২। প্রোটন আর নিউট্রনের ভর প্রায় সমান হওয়ায় তাদের একক ধরে নিয়ে পরমাণুকেন্দ্রের ভরকে অর্থাৎ পরমাণুতে প্রোটন ও নিউট্রনের সমষ্টিকে বলে পদার্থের পরমাণু-ভর বা পারমাণবিক ভর। অতএব কোন পদার্থের পরমাণু-ভর থেকে পরমাণুসংখ্যা বিয়োগ করলেই তাতে নিউট্রনের সংখ্যা পাওয়া যায়।

পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম বা গুণাগুণ মূলত তার পরমাণু-কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটনসংখ্যার ওপরই নির্ভর করে। সোনার পরমাণু-কেন্দ্রে থাকে ৭৯টি প্রোটন, আর পারদের পরমাণু-কেন্দ্রে আছে ৮০টি প্রোটন। কাজেই পারদের পরমাণু-কেন্দ্র থেকে কোনক্রমে একটি প্রোটন বের করে ফেলতে পারলেই তা সোনায় পরিণত হবে।

উনিশ শতকে ফরাসী বিজ্ঞানী মাদাম ক্যুরির আবিষ্কৃত রেডিয়াম থেকে তেজস্ক্রিয়ার ফলে বিচ্ছুরিত রশ্মি বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেল আল্‌ফা কণিকা(২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রনের

সমষ্টিতে গঠিত ইলেকট্রনবিযুক্ত হিলিয়াম পরমাণু), বিটা কণিকা (ইলেকট্রন) এবং গামা শক্তি–রশ্মি। পরমাণু সম্বন্ধে গবেষণায় রত রাদারফোর্ড দেখলেন, এক পরমাণুকে অন্য পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত করতে হলে আল্‌ফা কণিকার মতো সূক্ষ্ম শক্তিশালী কণা দিয়ে পরমাণু–কেন্দ্রকে আঘাত করে ভেঙ্গে দিতে হবে। আল্‌ফা কণিকা দিয়ে পরমাণুকে আঘাত করলে খানিকটা তেজ বিকীর্ণ করে সেটা পরিবর্তিত হয়ে যায় অন্য পদার্থে। আল্‌ফা কণিকার চেয়ে নিউট্রনই পরমাণু ভাঙ্গবার কাজে বিশেষ উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে। চ্যাড্‌উইকের নিউট্রন আবিষ্কারের পর পরমাণু–কেন্দ্রকে আঘাত করা সহজ হল। আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লরেন্স (E.O.Lawrence) সাইক্লোট্রন নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এর সাহায্যে নিউট্রন উৎপাদন করে পরমাণু ভাঙ্গা সহজ হয়েছে। গতিশীল নিউট্রনের ছট্‌রা কোন পদার্থের পরমাণুতে আঘাত করতে থাকলে তা ভেঙ্গে অন্য পরমাণুতে রূপান্তরিত হবার সময় প্রচুর পরিমাণ তাপ ও অন্যান্য ধরনের শক্তি বিকিরণ করে। ১৯৩২ সালে কক্রফ্‌ট্‌ ও ওয়াল্‌টন প্রোটনকে প্রচন্ড বেগশালী করে লিথিয়াম পরমাণুকে আঘাত করলেন—দু'টি হিলিয়াম পরমাণু প্রচুর শক্তি নিয়ে বেরিয়ে এল। প্রোটন ও হিলিয়ামের কেন্দ্র ডয়টেরনকে বেগযুক্ত করার জন্য লরেন্সের সাইক্লোট্রন ব্যবহার করা হতে লাগল। তবে অসুবিধে এই যে, পরমাণুকেন্দ্রকে ভাঙ্গার জন্য অনেক ছট্‌রা পাঠালে তা থেকে অতি অল্প সংখ্যকই কেন্দ্রে গিয়ে আঘাত করে ।

পরমাণু–বোমার আবিষ্কার কাহিনীর সঙ্গে তার আগের অন্তত পঞ্চাশ বছরের পদার্থ–বিজ্ঞানের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আগে বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য ছিল পরমাণু ভেঙ্গে এক পদার্থকে অন্য পদার্থে পরিণত করা। কিন্তু এরপর সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল, পরমাণু ভাঙ্গবার সময় যে প্রচন্ড শক্তি উৎপন্ন হয় তার দিকে। পরমাণুকে সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত করার একটা বিরাট সম্ভাবনা বিজ্ঞানীদের চোখে দেখা দিল। পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে তেজে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা সর্বপ্রথম দেখিয়েছিলেন আইনস্টাইন (Albert Einstein)। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব দিয়ে একটা সিদ্ধান্তে এলেন যে, পদার্থ আর শক্তি আসলে অভিন্ন । বিজ্ঞান জানত পদার্থ অবিনশ্বর, এর আর কোনও হ্রাস বৃদ্ধি নেই। আইন্‌স্টাইন্‌ বললেন, কথাটার একটু পরিবর্তন করা দরকার—ঠিক তা নয়, পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। লোকে প্রথমে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে নি, কিন্তু পরে উপযুক্ত প্রমাণ পেয়ে এ সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

গাণিতিক পরিভাষায় তাঁর সিদ্ধান্তকে লেখা হয় ঃ $E=mc^2$ (যেখানে E = শক্তি, c = আলোর বেগ, এবং m =বস্তুর ভর)। আইন্‌স্টাইনের সমীকরণ অনুসারে মাত্র ১ গ্রাম পদার্থ, 2.1×10^{10} কিলোক্যালরি শক্তির সমান। এ পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করতে ২,৫০০ টন কয়লা পোড়াতে হয়। এই বিপুল শক্তির কথা শুনতে অদ্ভুত শোনাবে, কিন্তু আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত । এর প্রথম পরীক্ষা হল পরমাণুর ভর বের করতে গিয়ে।

পরমাণু-শক্তির উৎসের কথা বুঝতে হলে পরমাণু-বীজ সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। আগেই বলেছি, ধনতড়িৎসম্পন্ন প্রোটনগুলো পরস্পর ঘনসন্নিবদ্ধ হয়ে আছে। তারা পরস্পর সমতড়িৎযুক্ত হয়েও বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে না, এর কারণ কি? যে শক্তি এই বিকর্ষণ অতিক্রম করে তাদের বেঁধে রেখেছে তাকে বলা হয় বীজের বন্ধন-শক্তি (binding energy)। এই বন্ধন-শক্তি কোথা থেকে এল?

আইনস্টাইন দেখালেন যে, এ আর কিছুই নয়, পরমাণু-ভর আংশিক ধ্বংস হয়েই এই বন্ধন-শক্তির উদ্ভব ঘটেছে। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেল সত্যি তা ঘটে। প্রোটন ও নিউট্রনের ভর যোগ করলে যত হওয়া উচিত পরমাণুর ভর তার চেয়ে সামান্য মাত্রায় কম হয়ে থাকে। এই বিনষ্ট ভরই পরমাণুর বন্ধনশক্তি। এহিসেবে ১ মাত্রা অর্থাৎ একটি প্রোটনের ভর প্রায় ৯০ কোটি ইলেকট্রনভোল্ট শক্তির সমান।

এক পরমাণুকে অন্য পরমাণুতে পরিবর্তিত করলে কিছু পরিমাণ পদার্থের লোপ হয়—শক্তির উদ্ভব ঘটে। আইনস্টাইন হিসেব করে বললেন, পদার্থের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন সম্ভব হলে তা থেকে সম-পরিমাণ কয়লা পুড়িয়ে উৎপন্ন শক্তির দু'কোটিগুণ বেশি শক্তি পাওয়া যাবে। এডিংটন বললেন, সূর্যের অভ্যন্তরে যে প্রায় দু'কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা রয়েছে, তাও এই পরমাণুর ভাঙ্গা-গড়া থেকে উৎপন্ন তেজেই নিয়ত অপরিবর্তিত থাকে।

১৯৩৮ সাল থেকে পরমাণু-শক্তির দিকে বিশেষভাবে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ইতালীয় পদার্থবিদ্ এন্‌রিকো ফার্মি (Enrico Fermi) পরীক্ষা করছিলেন, পরমাণু-কেন্দ্রে পরিবর্তন এনে নতুন পদার্থ সৃষ্টি করা যায় কি না। তিনি মনে করলেন তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছে, নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়ামকে আঘাত করে তিনি তার চেয়েও ভারি পরমাণু সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু বার্লিনে হান্ ও স্ট্রাস্‌ম্যান বললেন, তাঁর এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।

১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার মাত্র কয়েক মাস আগে জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান এবং তাঁর সহকর্মী ইহুদী মহিলা-বিজ্ঞানী মাইটনার (Lise Meitner) গবেষণা করে প্রমাণ করলেন যে, সবচেয়ে ভারি অথচ কম-মজবুত ইউরেনিয়াম ধাতুর পরমাণু-বীজকে সাইক্লোট্রন থেকে পাওয়া নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে, তা শুধু রূপান্তরিত হয় না, পরমাণু দু'টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায় এবং তা থেকে প্রভূত শক্তি ছাড়া পায়। একে বলা হয় বীজ-ভঙ্গ (nuclear fission)। বিজ্ঞানী বোটে (Bothe) অঙ্ক কষে দেখালেন, ইউরেনিয়াম পরমাণুর খন্ড দু'টি ১৮ কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসে। বীজভঙ্গ অনেক ধরনে ঘটতে পারে। হান্ তাঁর পরীক্ষায় পেয়েছিলেন এক টুকরো ৫৬ পরমাণু-সংখ্যাবিশিষ্ট বেরিয়াম, আর এক টুকরো ৩৬ পরমাণুসংখ্যার ক্রিপ্টন।

এই বীজ-ভঙ্গের ফলে ইউরেনিয়াম বীজ বাইরের নিউট্রনটিকে আটকে রেখে নিজের দেহ থেকে প্রচন্ড বেগশীল দু'তিনটি নতুন নিউট্রন বের করে দেয়। এরা আবার আরও দু'টি পরমাণু ভেঙ্গে দিলে চারটি নিউট্রন পাওয়া যায়। এমনি করে সব

নিউট্রনকেই বীজ-ভঙ্গের কাজে লাগান সম্ভব হলে দ্বিগুণ গুণোত্তর শ্রেণীতে (G.P.Series) ইউরেনিয়ামের সব পরমাণু ধ্বংস হয়ে প্রচুর শক্তির উদ্ভব হবে। নিউট্রনের বেগ সেকেন্ডে প্রায় ত্রিশ হাজার কিলোমিটার; তাহলে কল্পনা করুন, কত কম সময়ে কয়লার চেয়ে বিশগুণ ভারি ইউরেনিয়ামের কত পরমাণু ভেঙ্গে কী ভীষণ শক্তি উৎপাদন করে।

পরমাণু-বোমা সৃষ্টির যা মূল কথা, সেই ইউরেনিয়াম-ভঙ্গ মূলত জার্মান বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার; অবশ্য এর পূর্ণতার জন্য বিভিন্ন দেশের অন্তত দু'শজন বিজ্ঞানী দায়ী।

পরমাণু-শক্তি সম্বন্ধে চারদিকে প্রচার হলেও এর প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারলেন আমেরিকায় আশ্রিত গুটিকয়েক বিজ্ঞানী। ১৯৪০ সাল থেকেই তাঁরা সরকারকে এবিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছিলেন। কিন্তু তাতে সফল না হয়ে তাঁরা আইনস্টাইনকে গিয়ে ধরলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে একখানা ব্যাক্তিগত চিঠি লিখতে। আইনস্টাইনের চিঠি পেয়ে রুজভেল্ট তৎক্ষণাৎ এবিষয়ে গবেষণায় সহায়তা দেবার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়োজিত করলেন।

এভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা যখন পরমাণু-শক্তিকে কাজে লাগাবার কথা ভাবছিলেন, সে সময়ে অতি গোপনে সরকারী সহায়তায় গবেষণার কাজ চালিয়ে আমেরিকা পরমাণু-বোমা তৈরি করতে সমর্থ হল। তাদের গবেষণার তথ্য বাইরের জগতকে জানতে দেওয়া হয় নি; অতি সতর্কভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে। প্রথমেই জার্মানরা নরওয়েতে যে গবেষণাগার ও কারখানায় পরমাণু-বোমা তৈরি করবার চেষ্টা করছিল, তা ধ্বংস করে দেওয়া হল। তারপর ওক-রিজ (Oak Ridge) এবং প্যাস্‌কয়েন (Pascoin)-এ আমেরিকার বিরাট কারখানা স্থাপন করা হল পরমাণু-বোমা তৈরি করার জন্য।

পরমাণু-বোমার প্রথম পরীক্ষা হল নিউ-মেক্সিকোতে, অ্যারিজোনার মরুময় প্রান্তরে। প্রায় ত্রিশ মিটার উঁচু ইস্পাতের স্তম্ভের ওপর বোমা বসিয়ে ১৬ জুন ১৯৪৫ রাতের শেষভাগে এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটান হল। প্রায় দু'শ কিলোমিটার দূরের শহর আলবুকার্কের লোকেরা হঠাৎ অতি উজ্জ্বল আলোয় জেগে উঠে আশ্চর্য হয়ে গেল; দশ কিলোমিটার দূরে একজন লোক চোখ খুলেছিল বলে অন্ধ হয়ে গেল; ৮০ কিলোমিটার দূরে হোটেলগৃহ ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠল।

বাস্তবে বোমা তৈরি করতে ৭০ হাজার লোক অবিরত খেটেছে, আর চার্চিলের হিসেবে, এতে খরচ হয়েছে প্রায় দু'শ কোটি ডলার অর্থাৎ তখনকার হিসেবে ৬৭০ কোটি টাকা।

পরমাণু-বোমা তৈরির সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে এর মূল উপাদান ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করা। ইরেনিয়াম পরমাণুর গড়ন অত্যন্ত জটিল। এর কেন্দ্রে আছে ৯২টি প্রোটন আর ১৪৬টি নিউট্রন। যোগফলে এর পারমাণবিক ভর হয় ২৩৮। আবার ১৪৩টি

নিউট্রনবিশিষ্ট ইউরেনিয়ামেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তার পারমাণবিক ভর ২৩৫। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী অ্যাসটন (Aston) তাঁর ভর-বিশ্লেষক যন্ত্র (mass-spectrograph) দিয়ে দেখলেন যে, একই রকম পদার্থের বিভিন্ন রকমের পরমাণুভর থাকতে পারে। একই পরমাণুসংখ্যা-বিশিষ্ট বিভিন্ন ভরের পরমাণুকে 'আইসোটোপ' (isotope) বা সমস্থানিক বলা হয়।

একই মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলো হুবহু সমান, ডালটনের এ মত ক্রমশ ধূলিসাৎ হল। অনেক ক্ষেত্রে একই পদার্থের বিভিন্ন পারমাণবিক ভরের পরমাণু পাওয়া গেল। প্রকৃতিতে ৯২টি মৌলিক পদার্থের অন্তত ৩৮০ রকম আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে প্রোটন সংখ্যা ঠিকই থাকে—কেবল নিউট্রন সংখ্যার তারতম্য হয়। এভাবে ইউ-২৩৫ বা অ্যাক্টিনো-ইউরেনিয়াম, ইউ-২৩৮-এর আইসোটোপ। আইসোটোপের রাসায়নিক গুণাবলি সম্পূর্ণ এক রকমের বলে এদের পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন। দেখা গেল সবচেয়ে হালকা মৌল হাইড্রোজেনেরও একটি আইসোটোপ আছে—তার পরমাণুভর ২। এর কেন্দ্রকে প্রোটন না বলে বলা হল ডয়টেরন (Deuteron)। পরমাণু-বীজ ভাঙ্গবার কাজে এই ডয়টেরন ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯৪০ সনে বোর দেখালেন যে, সাধারণ ইউরেনিয়ামের বদলে ইউ-২৩৫ আইসোটোপ-কে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা হলে ৪টি নিউট্রন বেরিয়ে আসে এবং বেশি তেজের উৎপত্তি হয়। হিসেব করে দেখা গেল প্রকৃতপক্ষে শক্তি উৎপাদনে এর কার্যকারিতা সাধারণ ইউ-২৩৮-এর চেয়ে হাজারগুণ বেশি। আবার এই বিশেষ রকমের ইউ-২৩৫ সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ। সাধারণ ইউরেনিয়ামের সঙ্গে মাত্র ১৪০ ভাগের এক ভাগ মাত্রায় এটি থাকে। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষায় এই দু'রকমের ইউরেনিয়ামকে একই বলে মনে হয়, তাই এদের পৃথক করা খুব শক্ত।

কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া বা চেকোশ্লোভাকিয়ায় হয়তো পিচ্‌ব্লেন্ড ধাতু পাওয়া গেল, অনেকটা পিচ্‌ব্লেন্ড থেকে প্রচুর পরিশ্রমে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পাওয়া গেল সামান্য ইউরেনিয়াম। আবার তা থেকে ইউ-২৩৫ সংগ্রহ করবার সবচেয়ে যে আধুনিক উপায়, তাতে এক কেজি পরিমাণ বের করতে সময় লাগবে অন্তত এক হাজার বছর। ১৯৪০ সালেও মার্কিন বিজ্ঞানীরা এক কেজি ইউরেনিয়াম থেকে দশ কোটি ভাগের এক ভাগের বেশি ইউ-২৩৫ বের করতে পারেন নি। ১৯৪৫ সালে নিশ্চয় পেরেছেন, তবে কি উপায়ে তা জানা যায় নি।

এর মধ্যে সাধারণ ইউ-২৩৮কে ইউ-২৩৫ থেকে বেরিয়ে আসা নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে কৃত্রিম উপায়ে প্লুটোনিয়াম নামে এক নতুন ধাতু পাওয়া গেছে, যা সর্বতোভাবে ইউ-২৩৫-এর কাজ দেয়। আর একে ইউ-২৩৮ থেকে সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই প্লুটোনিয়ামকেই সম্ভবত পরমাণু বোমায় ব্যবহার করা হয়েছে।

বোমা তৈরির দ্বিতীয় কঠিন কাজ হচ্ছে নিউট্রন সদ্য সদ্য উৎপন্ন করা। কিভাবে বোমার কাজে এ সমস্যার সমাধান হয়েছে তা আজও জানা যায় নি। পরমাণু-বোমার ধ্বংস-

ক্রিয়া যে পরমাণুর প্রচন্ড শক্তি থেকেই, এটা স্থির নিশ্চিত। তবে বোমার অভ্যন্তরে কিভাবে বীজভঙ্গ ঘটান হয়েছে সে তথ্য গোপন রাখা হয়েছে। সাইক্লোটনের মতো বিরাটকায় যন্ত্র বোমার ভেতরে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এর জন্য নিশ্চয় কোন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছিল।

এখন কথা হচ্ছে, ইউরেনিয়াম ছাড়া অন্য পদার্থ দিয়ে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটান যায় না কেন। এটা বুঝতে হলে তেজস্ক্রিয় পদার্থর পরমাণু সম্বন্ধে ভাল ধারণা থাকা দরকার। এসব পরমাণু বেশ ভারি এবং এদের কেন্দ্রের গড়ন কিছু কম মজবুত; এজন্যই এদের দেহ থেকে অবিরত শক্তি বিচ্ছুরিত হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে আবার ইউরেনিয়াম সবচেয়ে ভারি এবং অপেক্ষাকৃত সুলভ হওয়ায় একেই বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহার করা সহজ হয়েছে। অন্যান্য সব পদার্থের পরমাণুর গড়ন খুব সুদৃঢ় এবং তাদের ভাঙ্গতে আরও প্রচন্ড শক্তির দরকার।

পদার্থের সম্পূর্ণ ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা আজও সম্ভব হয় নি। পরমাণু-বোমায় পদার্থের মাত্র এক সহস্রাংশকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। এক কেজি পারমাণবিক বিস্ফোরক প্রায় ত্রিশ হাজার টন টি.এন.টি.-র সমান। বোমা ফাটাবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপের সৃষ্টি হয় ১০ কোটি ডিগ্রি, আর $১০^{৯}$ বায়ুমন্ডলের চাপে ধোয়ার কুন্ডলী ও ধ্বংসলীলা নিমেষে দশ-পনের কিলোমিটার ওপরে উঠে যায়। তাই ধীরে ধীরে নামার জন্য বোমার সঙ্গে প্যারাস্যুট বেঁধে দেওয়া হয়।

ইউ-২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম-২৩৯কে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে যে তেজের উৎপত্তি হয় তা সমপরিমাণ বারুদের বিস্ফোরণের চেয়ে এক কোটি গুণ বেশি শক্তিশালী। পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণে সময়ের হিসেব একটা খুব বড় জিনিস। এর মূল উপাদান এক সেকেন্ডেরও অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যে আপনা আপনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে প্রলয়ঙ্কর শক্তির উৎপত্তি হয়।

যেভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল, তাতে সমগ্র সভ্য জগৎ হয়ে উঠল আতঙ্কগ্রস্ত। মানুষ দেখল, সূর্যের যে শক্তি পৃথিবীর বুকে জীবনের স্পন্দন জাগিয়ে রেখেছে মানুষ আজ সেই শক্তির অধিকারী। এই প্রচন্ড শক্তিকে ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োজিত করা হলে তা দিয়ে যে বিরাট ধ্বংসের কাজ চলবে পৃথিবীতে তাতে অল্পদিনেই মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়। এই ভয়ঙ্কর মারণ-বিভীষিকা কোনও আন্তর্জাতিক আইন মানবে না, মানুষের সভ্যতার কোনও মূল্য দেবে না—জগতকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। এশক্তির কাছে সামরিক অসামরিকের প্রশ্ন নেই, শান্তিকামী যুদ্ধকামীর বাছ-বিচার এ কখনো করবে না। মানুষ ভেবে দেখল, এ সর্বনাশা শক্তি মানুষের আয়ত্তের বাইরে। মানুষ আজও বুঝি এশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার মতো যথেষ্ট সভ্য হয় নি।

সমগ্র মানবজাতি এর পরিণতির কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠল। আজ হয়তো এ-গোপনশক্তি পরমাণু-বোমার নির্মাণরহস্য শুধু দু'একটি দেশের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন) আয়ত্তে আছে; বেশিদিন এ-রকম থাকবে বলে মনে হয় না। অনেক রাষ্ট্রই

এবিষয়ে জোর গবেষণা চালাচ্ছে। একদিন যে অন্যান্য সভ্যদেশ এর রহস্য উদঘাটন করতে পারবে না, বা ভীষণতর কোন মারণাস্ত্র আবিষ্কার করতে পারবে না, এমন কোন কথা নেই। বিজ্ঞানীরা বলছেন, পরমাণু-বোমা তৈরি করতে অন্য কোন রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের পাঁচ বছরের বেশি সময় লাগবে না। তখন কি অবস্থা হবে ? রাশিয়া এর মধ্যেই বলছে যে, পরমাণু-বোমার রহস্য তাদের কাছে নতুন কিছু নয়।

পরমাণুর ভয়ঙ্কর শক্তির আবিষ্কারে যে ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহ ক্রমেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে তার কল্পনাতেও মানুষ শঙ্কাকুল হয়ে উঠছে। বিশেষ করে এই ভীষণ মারণাস্ত্র যদি দু'টি মাত্র রাষ্ট্রের হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে আরও জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। পৃথিবীর দুর্বল দেশগুলোর ওপর এই শক্তির অপব্যবহার করে তারা বিভিন্ন দেশের গণ-জাগরণকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিতে পারে। মানুষের নিজের আবিষ্কৃত মারণাস্ত্রে মানুষের নিজের ধ্বংসই তাহলে অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে।

নব-উদ্ভাবিত অপরিমেয় পরমাণু-শক্তির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বিজ্ঞানীদের হাতে। এতে তাঁরা মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারেন, আবার রাজনীতিকদের ক্রীড়নক হয়ে পৃথিবীর ধ্বংসসাধনে সহায়তা করতে পারেন। আশার কথা এই যে, পরমাণু-বোমার ব্যবহারে যে মিত্রপক্ষের জয় সুনিশ্চিত হয়েছে, সেই মিত্রপক্ষের চিন্তাশীল মনীষীরাই আজ এর ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করছেন। মানুষের নৈতিক শুভবুদ্ধি ও সৎসাহস পারমাণবিক ধ্বংস লীলার দিনেও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। মানব সমাজের কল্যাণকামী বিজ্ঞানীরা যেসব পরিকল্পনা করছেন তাতে শীগ্‌গিরই হয়তো তেল, কয়লা ও বিদ্যুতের যুগ শেষ হয়ে শক্তির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হবে।

[১৩৫২/১৯৪৬]

পরমাণু–শক্তি ও সভ্যতার নবযুগ

জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপর প্রথম পরমাণু–বোমা পড়বার খবর প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়ে এক বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল; আজও যে এই রহস্য সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল ও উত্তেজনা কিছুমাত্র কমেছে তা বলা চলে না। পরমাণু–শক্তির ব্যাপারটা সতর্ক গোপনীয়তার অন্তরালে থেকে আজও পৃথিবীর মানুষের কাছে যেন একটা দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা হয়েই রয়েছে।

এ–প্রসঙ্গে সাময়িক পত্রে নানা রকম উদ্ভট ও আজগুবি খবর বেরিয়েছে। জনসাধারণের মনে থ্রিল বা চমক সৃষ্টির জন্যও অনেক গুজব প্রচারিত হয়েছে। কোন কোন বিজ্ঞানী নাকি বলেছেন, পারমাণবিক রশ্মির প্রভাবে আগামী যুগের জাপানীরা 'অদ্ভুত অতিমানুষ' হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে পারে—এমনকি তাদের কারও চারটি পা বা দু'টি হৃৎপিন্ড থাকাও বিচিত্র নয়। দেহের ওপর এ–ধরনের ক্রিয়ার অনেক খবরও শোনা গিয়েছে। বোমার বিস্ফোরণ থেকে যে–সব নারী প্রাণ নিয়ে বেঁচেছে তাদের নাকি নানা রকম দৈহিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগে যারা আজীবন বন্ধ্যা ছিল, তাদের অনেকের এখন সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, কোন কোন বৃদ্ধা নাকি আবার যৌবন ফিরে পেয়েছে।

ভবিষ্যতে পরমাণু–শক্তিকে কিভাবে কাজে লাগানো হবে সে সম্বন্ধেও অনেক উৎসাহী কল্পনাবিলাসী জল্পনা–কল্পনা করছেন। উর্বর কল্পনাশক্তির প্রভাবে আগামী পরমাণু–যুগের মানবসভ্যতার অনেক মনোরম চিত্র তাঁরা আঁকছেন। বিজ্ঞানের সেই সর্বোচ্চ উন্নতির যুগে মানুষ মেরু প্রদেশে ফুল ফোটাবে, মরুভূমির বুক শস্য–শ্যামল করে তুলবে; নিরক্ষীয় প্রদেশের উষ্ণ আবহাওয়া থেকে শীতের রাজ্য মেরু প্রদেশে যাওয়া আসা হবে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। চাই কি, তখন হয়তো মানুষ মাটির নিচে শহর তৈরি করে থাকাটাই বেশি পছন্দ করবে; আর জমিনের ওপর থাকবে সুন্দর সুন্দর খেত, বাগান, বন । সব রকমের দৈহিক শ্রম ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে সেদিন মানুষ ধরার ধূলিতে বেহেশ্‌ত রচনা করবে।

সে যাই হোক, এসব আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, এযাবৎ পরমাণু সম্বন্ধে বেশির ভাগ আলোচনাই হয়েছে শুধু বোমাকে কেন্দ্র করে, কিন্তু শান্তির সময়ে পরমাণুর অন্তর্নিহিত বিপুল শক্তিসম্ভারকে সত্যি সত্যি ব্যবহারযোগ্য করে মানুষ কিভাবে কাজে

লাগাতে পারবে সে সব নিয়ে সার্থক আলোচনা বিশেষ কেউ করছে না। আজ যা সব চাইতে বেশি আলোচনা করা দরকার সে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতের বাস্তব সম্ভাবনা; আজ থেকে দশ-পনের বছরের মধ্যে কত বিভিন্ন কাজে পরমাণু-শক্তিকে ব্যবহার করা যাবে, তারই পরিকল্পনা। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাহস করে কেউ যে কিছু বলতে পারছেন না, তার অনেক কারণ রয়েছে।

পরমাণু-বোমা সব বুদ্ধিজীবী মানুষের সামনে এমন বিরাট এক আন্তর্জাতিক বিশ্ব-সমস্যা এনে হাজির করেছে যে, অন্য কোনও দিক থেকে একে বিচার করবার ক্ষমতাই যেন মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। এই বোমা তৈরি করবার খরচের যে বিরাট অঙ্ক (দুই বিলিয়ন ডলার—প্রায় ৬৭০ কোটি টাকা) সাধারণের সামনে ধরা হল, তাতে অনেকেই মাথা নেড়ে ভাবলেনঃ নাঃ! এত খরচ করে একে কোন ভাল কাজে লাগানো সম্ভব হবে না।[১] সরকারীভাবে পরমাণু-শক্তির ওপর যে রিপোর্ট (Smythe Report) প্রকাশ করা হল—সাধারণের জন্য তা একেবারেই দুর্বোধ্য। সোজা কথা বিশ্বাস করতেই মানুষের ঝোঁক বেশি; তাই নানা আজগুবি কাহিনী, যেমন এক টুকরো কয়লার পরমাণু-শক্তি দিয়ে চাঁদ পর্যন্ত রকেট চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে—এসব শুনে এমনই অবিশ্বাস্য মনে হল যে, লোকে আর একে মোটেই গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাইল না।

তাছাড়া সামরিক কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে এমন কড়াকড়িভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করতে লাগলেন যে, এমন অনেক কিছু সংবাদ যা সকলের জানা উচিত ছিল, জানলে কোন ক্ষতিই হত না—তাও জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করতে দেওয়া হল না। তার ফলে বিজ্ঞানের এই নবতম যুগান্তকারী আবিষ্কারের গোড়ার কথাটাই ব্যাপক জনসাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অজানা রয়ে গেল। এই বিরাট আবিষ্কারের বিপুল গুরুত্ব ও সম্ভাবনা লোকে বুঝে উঠতে পারল না।

কিন্তু ধীরে ধীরে বোমা সম্বন্ধে মানুষের ঔৎসুক্য কমে আসতে বাধ্য। আজ সময় এসেছে ধীরভাবে মানুষের ভবিষ্যৎ পরিণতি বা পরবর্তী পদক্ষেপের কথা চিন্তা করবার। আজ সমগ্র মানব জাতিকে সমবেতভাবে চিন্তা করতে হবে, আগামী যুগের মধ্যে পরমাণু-শক্তিকে কি ধরনের বাস্তব কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হলে হয়তো দেখা যাবে, যে শক্তি পরমাণুকেন্দ্রে এতদিন ধরে ঘুমিয়ে আছে, তা মানুষের কাছে অভিশাপ নয়, তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

আজ তাই এব্যাপারে আর গোপনীয়তা রক্ষা করবার কোনও অর্থ হয় না। মানুষের সভ্যতা নিরন্তর এগিয়ে চলেছে অগ্রগতির দিকে। গোপনীয়তার ফলে এই অগ্রগতি কিছুদিনের জন্য প্রতিহত করে রাখা যায় মাত্র, কিন্তু একদিন না একদিন প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হবেই। বোমায় পরমাণু-শক্তির ব্যবহার বন্ধ করা দরকার, এতে কারও দ্বিমত হতে পারে না—বন্ধ করতেই হবে। এই ধ্বংসাত্মক দিক থেকে পরমাণু-শক্তিকে রক্ষা করতে পারলেই এ-শক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথে নিজের স্থান করে নেবে। ব্যয়ের বিপুল অঙ্ক দেখে ভুল ধারণা হওয়া খুবই সম্ভব। এশুধু উৎপাদন ব্যয় নয়, এর মধ্যে পড়ে পাঁচ বছরের কাজের সমস্ত খরচ—তাও আবার যুদ্ধের বাজারে চড়া দামে।

---

[১]এই দুই বিলিয়ন ডলারের হিসেব ১৯৪৫ সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

দু'বিলিয়ন ডলারের যে হিসেব, তার মধ্যে ধরা হয়েছে সমস্ত গবেষণার খরচ, এককালীন মূলধন, সব কাঁচামাল, জন-শ্রম, প্রায় একলক্ষ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের পৃথক আবাস। এই হিসেবের মধ্যেই আসে, ছ'টি বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠা, ওক্-রিজ-এর চারটি ইউরেনিয়াম পৃথক করবার কারখানা[১]· হানফোর্ড-এর তিনটি পারমাণবিক চুল্লি (pile)[২], লস অ্যালামস-এ অধুনাতম পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার স্থাপন এবং ইয়েল, কলম্বিয়া, প্রিন্সটন, রচেস্টার, শিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া এবং আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত গবেষণা চালাবার সমস্ত খরচ। এই খরচের মধ্যেই তিনটি সম্পূর্ণ নতুন শহর গড়ে উঠেছে—ওক-রিজ-এর লোকসংখ্যা ৭৮,০০০, রিচল্যান্ড-এর লোকসংখ্যা প্রায় ১৮,০০০ আর লস অ্যালামস-এর বাসিন্দা প্রায় ৬,০০০।

ব্যয়ের তালিকায় সবচেয়ে বেশি খরচ পড়েছে ওক-রিজে একটা গ্যাসীয় পৃথকীকরণ প্ল্যান্ট বসাতে—প্রায় ১৭০ কোটি টাকা। ইউরেনিয়াম পৃথক করবার সমস্ত প্ল্যান্টগুলোর মধ্যে এটার কাজ সবচেয়ে ভাল হয়েছে—আর সম্ভবত এর পর থেকে শুধু এখানেই কাজ চালানো হবে। এসব ব্যয়ের অঙ্কের প্রসঙ্গে একটা দরকারী কথা মনে রাখতে হবে যে, শান্তির সময়ে পরমাণু-শক্তি উৎপাদন করতে এত বেশি খরচ মোটেই পড়বে না। খরচ কত পড়বে তা অবশ্য এখন কিছুই ঠিক করে বলা যায় না, তার কারণ সে সব যন্ত্র তৈরি করাই হয় নি। কিন্তু ইতোমধ্যে গবেষণা চলছে, অসামরিক ব্যবহারের জন্য অল্প পরিমাণে পরমাণু-শক্তি উৎপাদন করতে কি ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হবে তা নিয়ে।

সাধারণ গণিতের সহজ হিসেবে বর্তমান মূল্যের ইউরেনিয়াম থেকে কয়লার চেয়েও সস্তায় শক্তি উৎপাদন করা যাবে। তথ্যের দিক দিয়ে এক কেজি ইউরেনিয়ামে যে শক্তি রয়েছে হাজার টন কয়লা পুড়িয়ে সেই পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় । কিন্তু বিজ্ঞানীরা এপর্যন্ত পদার্থ-শক্তির মাত্র এক হাজার ভাগের এক ভাগকে কাজে লাগাতে পেরেছেন। ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনাই ওইখানে—আরও বেশি শক্তিকে আয়ত্ত করতে হবে। এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনার ক্ষেত্র—বিজ্ঞানের লক্ষ্য।

ভাল করে সমস্যার গুরুত্ব বুঝবার জন্য খোলাখুলিভাবে সমগ্র তথ্যের আলোচনা দরকার। সাধারণ শিক্ষিত মানুষ যেন ব্যাপারটা কিছু কিছু বুঝতে পারে, এর জন্য সহজ ভাষায় এর ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ আরও কিছু গোপন সংবাদ প্রকাশ না করলে তা হবার উপায় নেই। যেদিন সব খবর জানা যাবে, আগামী দশপনের

১· সাধারণ ইউরেনিয়াম ২৩৮-এর আইসোটোপ ইউরেনিয়াম-২৩৫। শেষোক্ত ইউরেনিয়ামই পরমাণু-বোমায় দরকার হয়। কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ ইউরেনিয়াম থেকে একে পৃথক করা যায় না। ইউ-২৩৫ পৃথক করবার চারটি প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে গ্যাসীয় পৃথকীকরণ প্রধান।

২· পারমাণবিক চুল্লি হচ্ছে ইউরেনিয়াম ভঙ্গ বা বিস্ফোরণের জন্য সমচতুষ্কোণ ঘনকাকৃতি প্রকোষ্ঠ। বিস্ফোরণের গতি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এর চতুর্দিকে খুব পুরু গ্র্যাফাইট থাকে। এই চুল্লি দিয়ে ইউরেনিয়াম ২৩৫ থেকে প্লুটানিয়াম ২৩৯ উৎপাদন করার প্রক্রিয়ায় প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি হয়।

বছরের মধ্যে পরমাণু-শক্তিকে মানুষের কি কি কাজে লাগানো সম্ভব হবে তার সত্যি কাহিনী যেদিন প্রকাশ করা হবে, সেদিন মানুষের অনেক কৌতূহল যে মিটবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আগামী নব-যুগের পারমাণবিক সম্ভাবনার মধ্যে থাকবেঃ

ক. চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণার এক বিস্তীর্ণ নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হবে। মানুষ জানবে, শিখবে, কি করে মানুষের দেহযন্ত্র কাজ করে; তার কাজের দক্ষতা কিভাবে আরো বাড়ানো যায় — সে সম্বন্ধে নতুন তথ্যের আলোক-সম্পাত হবে। এথেকে আরম্ভ হবে রোগের বিরুদ্ধে মানুষের চিরন্তন সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়, মানুষের ইতিহাসে এক নতুন যুগের উদ্বোধন ঘটবে।

খ. পরমাণু-শক্তির উৎস, ইউরেনিয়াম 'চুল্লি' নতুন করে নতুন নকশায় তৈরি করা হবে। এ থেকে শক্তি উৎপাদনের জন্য বাষ্প তৈরি হবে। শহরের প্রতি গৃহে উষ্ণ জল বা বাষ্প সরবরাহ করার জন্যও একে তাপ-জননকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা চলবে। এপ্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, প্রতিটি বাড়িতে সাধারণ চুল্লির পরিবর্তে পারমাণবিক চুল্লি বসানো আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কাছে অবাস্তব।

গ. রসায়ন-বিজ্ঞানেও গবেষণা করার প্রচুর ক্ষেত্র তৈরি হবে। গবেষণা চলবে ইউরেনিয়াম ছাড়া আর কোন্ কোন্ পদার্থ থেকে পরমাণু-শক্তি বের করা সম্ভব তা নিয়ে। এই গবেষণার সাফল্যের ওপর পরমাণু-শক্তির ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করছে। সাধারণ বস্তু থেকে শক্তি উৎপাদন করা গেলে ব্যয়-সংক্রান্ত অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ঘ. শিল্প-জগতে পাঁচ হাজারেরও বেশি নতুন পণ্য দ্রব্য ও প্রক্রিয়ার ব্যবহার হবে, আর তাতে জীবনের সব ক্ষেত্রেই একটা পরিবর্তন আসবে, প্রগতি আসবে। পরমাণু-শক্তির সঙ্গে এদের কোনই সম্পর্ক নেই, কিন্তু পরমাণু-গবেষণা চালাতে গিয়ে সহায়ক হিসেবে এগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। সব ধরনের উৎপাদন শিল্পই এথেকে প্রভাবান্বিত হবে; পাম্পিং, লুব্রিকেশন, গ্যাস, করোসিভ, কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা—এসবের অনেক নতুন পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। কতকগুলো শিল্প, যেমন, পেট্রল শোধন, গ্যাস ও রাসায়নিক শিল্প, বিদ্যুৎশিল্প এবং যেসব শিল্পে রেফ্রিজিরেশন ও ভ্যাকুয়াম ব্যবহৃত হয় বা উৎপন্ন হয়, এগুলো বিশেষভাবে লাভবান হবে।

ঘ. পরমাণু-বোমা তৈরি পৃথিবীর বৃহত্তম গবেষণা প্রকল্পের ফল। এথেকে পৃথিবীর শিল্পপতি, যন্ত্রবিদ এবং বিজ্ঞানিগণ একযোগে কাজ করবার অনেক নতুন পদ্ধতি শিখেছেন। ভবিষ্যতের অন্যান্য গবেষণাও হবে এমনি ব্যাপকভাবে এবং তা থেকে সমগ্র মানব সভ্যতা লাভবান হবে।

এগুলো হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে পরমাণু-শক্তির কতকগুলো বাস্তব দিক, হাজার বছর পর জগতের অবস্থা কেমন হবে না হবে সে ধরনের ভাববিলাসী কল্পনা নয়। এই সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তব পরিকল্পনা ও রূপ দেবার দায়িত্ব আজকের বিজ্ঞানীদের হাতে, রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের হাতে, জনসাধারণের হাতে।

[১৩৫২/১৯৪৬]

বিকিনি

বিকিনি।.... উদার মহাসাগরের বুকে ছায়ার মায়ায় ঘেরা ছোট্ট প্রবাল দ্বীপ। সেখানে মানুষ কম, প্রকৃতির সৌন্দর্য বেশি—নগ্ন প্রকৃতির সৌন্দর্য!

অনেকখানি পানিকে ঘিরে রয়েছে সরু স্থলের ফালি; সাগরের তাল-নারকেলের গাঢ় সবুজ বন। ভোরের বাতাসে সুদীর্ঘ নারকেল পাতাগুলো কাঁপতে থাকে। শিশির-ভেজা সবুজ পাতা সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করে ওঠে।

বিকিনি, কাওয়াজেলিন, এনিওয়েটক, রঙ্গ্যাপ এবং আরও কয়েকটি ছোট ছোট প্রবালদ্বীপ নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ। যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন, এই বিকিনি প্রবাল বলয়ের মাঝখানে পরমাণু-বোমার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। জায়গাটা মানুষের লোকালয় থেকে, বড় জনপদ থেকে সুদূর দূরে (ঢাকা থেকে প্রায় ন' হাজার কিলোমিটার)। তবু অনেক বিজ্ঞানী শঙ্কিত হলেন। এই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও না আবার পৃথিবীসুদ্ধ গুঁড়িয়ে যেতে হয়!

কিন্তু, না। বিস্ফোরণ নিরাপদে ঘটেছে; তেমন ভয়ঙ্কর কোন বিপদ ঘটে নি। পরমাণু-বোমার বিপুল খরচ বাদ দিয়ে প্রায় ২১ কোটি টাকা ব্যয়ে এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের তোড়জোড় আরম্ভ হল। বিকিনি প্রবাল বলয়ের মধ্যে নানা আকারের, নানা ধরনের ৭৩টি জাহাজ রাখা হল—বোমার আঘাতে ধ্বংস হবার জন্য। জাহাজ-গুলো বেশির ভাগই পুরনো; তাই খরচ ২১ কোটি টাকার মতো, এসব জাহাজ আবার নতুন করে তৈরি করবার খরচ ধরলে ব্যয়ের অঙ্ক আরও বহুগুণ বেশি হবে।

এই জাহাজগুলোর মধ্যে ছিল যুদ্ধ-জাহাজ, ক্রুজার, বিমানবাহী জাহাজ, সাবমেরিন এবং আরো নানা ধরনের জাহাজ। এসব জাহাজে পারমাণবিক বিস্ফোরণে ক্ষতির পরিমাণ কিরকম হয় তা দেখেই ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র তার জাহাজগুলোতে উপযুক্ত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করবে। জাহাজগুলো অমনি শুধু শুধু সমুদ্রের ওপর ফেলে রাখা হয় নি। প্রত্যেক জাহাজ দূর থেকে যাতে চিনতে পারা যায় তার জন্য বিশেষভাবে রং করা হয়েছে। তারপর তার ভেতর নানারকম সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে—তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণের ফলাফল পরীক্ষা করবার জন্য। কোন জাহাজে রাখা হল পেট্রল, কোন জাহাজে নানারকম ব্যাধির জীবাণু। তেত্রিশ হাজার টনী যুদ্ধ-জাহাজ পেন্‌সাকোলায় ছাগল, শূকর, ইঁদুর ভরে দেওয়া হল। বিস্ফোরণ শেষে এগুলোকে সাবধানে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

সবগুলো জাহাজকে প্রবাল বলয়ের মধ্যে সাজিয়ে রাখা হল। মূল যে জাহাজটির ওপর পরমাণু-বোমা সরাসরি ফেলা হবে তার নাম 'নেভাদা'—এটাকে সাদায় কমলায় রং করে দেওয়া হল। বিস্ফোরণের সময় উত্তাপ কতখানি হয় সেটা পরীক্ষা করার জন্য বিজ্ঞানীরা জাহাজের বিশেষ জায়গায় এমন রং লাগিয়ে দিলেন যার পরিবর্তন দেখে উত্তাপের পরিমাণ স্থির করা যাবে।

এ তো গেল প্রবাল বলয়ের ভেতরকার ব্যাপার। এর বাইরে যেসব ব্যবস্থা করা হল তাও কম জমকালো নয়।

সহকারী নৌ-সেনাধ্যক্ষ উইলিয়াম ক্যাণ্ডিকে দেওয়া হয় এই পরীক্ষাকার্যের নেতৃত্ব। তিনি এজন্য সবসুদ্ধ দু'শরও বেশি জাহাজ, দেড়শ'টি বিমান এবং প্রায় ৪০ হাজার মানুষ আনিয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিলেন বহু বিজ্ঞানী, খবর সংগ্রহ করবার জন্য সমবেত হয়েছিলেন প্রায় দু'শ সাংবাদিক। সাংবাদিকরা ছিলেন পরীক্ষা-কেন্দ্র থেকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে পর্যবেক্ষক জাহাজ অ্যাপেলেশিয়ান-এ। বিস্ফোরণ যেন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পান সেজন্য জাহাজে সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দেখার জন্য টেলিভিশনের ব্যবস্থা ছিল। অধ্যক্ষ ক্যাণ্ডি নিজে ছিলেন কম্যাণ্ড জাহাজ মাউন্ট ম্যাক্‌কিন্‌লিতে—বিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে আঠার কিলোমিটার দূরে।

বলাবাহুল্য বিকিনি প্রবালদ্বীপে যে অল্পসংখ্যক বাসিন্দা ছিল তাদের বেশ আগে থেকেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অনেক পুবদিকে রংএরিক দ্বীপের নিরাপদ আশ্রয়ে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কিছু ঠিকঠাক করা হল। তারপর এল নির্দিষ্ট দিন। পয়লা জুলাই ১৯৪৬।

বিকিনির প্রভাত। সমুদ্রের বুক থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে জেগে উঠল ভোরের সূর্য। নির্জন বিকিনি দ্বীপে নতুন ভোরের আলো। সে আলো গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাওয়াজেলিনে। লুটিয়ে পড়ল কাওয়াজেলিনের পরমাণু-বোমার ওপর।

গুরুদায়িত্ব ছিল আবহাওয়াবিদদের ওপর। তাঁরা জানালেনঃ আকাশ পরিষ্কার, পরীক্ষা চলবে। ক্যাণ্ডির অফিস থেকে চতুর্দিকে সংবাদ ছুটল, পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হবে।

চল্লিশ হাজার মানুষ। বিকিনির আশেপাশে অনেক দূরে দূরে পনের কিলোমিটারের বিপদ-সীমার বাইরে চল্লিশ হাজার মানুষ উদগ্রীব, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

বিকিনির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে কাওয়াজেলিন দ্বীপ থেকে সোমবার ভোর ছ'টায় 'ডেভ্‌স ড্রিম' বিমান পরমাণু-বোমা নিয়ে আকাশে উড়ল। ঠিক এধরনেরই একটি বোমা জাপানের নাগাসাকি শহরের ওপর প্রলয়ঙ্কর মৃত্যু-তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল; তারই জাতভাই চলল বিকিনির দিকে। এর পিছে পিছে চলল আরও কতকগুলো পর্যবেক্ষণ বিমান—তার ভেতরে থেকে প্রত্যক্ষভাবে পরমাণবিক বিস্ফোরণের ধ্বংসলীলা দেখবার জন্য চললেন বিজ্ঞানী আর সাংবাদিকগণ।

বিকিনির পশ্চিমে এনিওয়েটক দ্বীপ থেকে রেডিও-চালিত মক্ষিকা-বিমানগুলোও বিকিনির দিকেই উড়ে চলল।

'ভেভ্‌স্‌ ড্রিম' বিকিনির ওপর দিয়ে কয়েকবার পাক খেল—লক্ষ্যবস্তু নেভাদা জাহাজের ওপর থেকে হালকা মেঘগুলো সরিয়ে দিল। তারপর সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে—বিকিনি সময় ন'টা (বেঙ্গল টাইম ভোর সাড়ে চারটা) বাজবার আধ মিনিট আগে, বোম্বার্ডিয়ার মেজর হ্যারল্ড উক সাগরের দু'শ কিলোমিটার ওপরে একটি বোতাম টিপলেন—সঙ্গে সঙ্গে ভয়াল পরমাণু-বোমা তার প্রচণ্ড সুপ্ত শক্তি নিয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে এল। চল্লিশ হাজার উৎসুক মানুষ তার বিস্ফোরণের ভয়াবহতা অনুভব করলেন।

অনেক উঁচু পর্যবেক্ষণ বিমান থেকে যাঁরা বিস্ফোরণ দেখেছেন তাঁরা এর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবেঃ

প্রথমে একটা সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ আলোর বিন্দু দেখা গেল—একটা উত্তপ্ত সাদা পিনের ডগার মতো; এর রশ্মি একেবারে চোখের ভেতরে প্রবেশ করে। তারপর প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল আলোর ঝলকানি—ভীষণ চোখধাঁধানো কমলা রঙের আলো—তাকে চর্মচক্ষুতে দেখবার চাইতে অতীন্দ্রিয় দিয়ে অনুভবই করতে হয় বেশি। এরপরেই দেখা গেল পরমাণু-বোমার বিপুল শক্তি। উজ্জ্বল আলোর শিখা ছড়িয়ে একটা বিরাট সাদা অগ্নি-গোলক চোখ ধাঁধিয়ে পাক খেতে খেতে ওপর দিকে উঠছে—সমস্ত বিকিনি দ্বীপকে এটা ঢেকে দিয়েছে। আর তার ভেতর দিয়ে একটা গাঢ় লাল রঙের মেঘ ছত্রাকারে প্রায় বিশ কিলোমিটার উঁচুতে উঠে গেল। তেজস্ক্রিয় ধূমজাল মেঘের ওপর দিয়ে বিস্তৃত হল।

এই মেঘের স্তম্ভ ধীরে ধীরে গাঢ় ধূসর ও সাদা রঙের মেঘে রূপান্তরিত হল; পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার সে মেঘ অদৃশ্য হল।

বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই স্থল ও জাহাজ থেকে রেডিও-চালিত মক্ষিকা-বিমানগুলো মেঘপুঞ্জের মধ্যে ঢুকে যায়। যে তেজস্ক্রিয় মৃত্যুমেঘ বায়ুর উঁচুস্তরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল তাকে অনুসরণ করবার জন্য কয়েকটি মক্ষিকা-বিমান পাঠানো হয়—কিছুদূর গিয়েই এই মেঘ হারিয়ে যায়। শুধু একটি ছাড়া আর সব মক্ষিকা-বিমান মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে নিরাপদে ফিরে আসে। বিস্ফোরণের নিকটবর্তী স্থানের সমুদ্রজল পরীক্ষা করবার জন্য রেডিও-চালিত নৌকাও পাঠানো হয়েছিল।

চারদিক যখন পরিষ্কার হয়ে গেল তখন সবাই দেখতে পেল নেভাদা জাহাজ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে; সম্ভবত বোমাটি সঠিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর পড়ে নি। লক্ষ্য-কেন্দ্রের অনেক দূরের জাহাজেও তাপ-রশ্মির প্রভাবে আগুন লেগেছিল। বিস্ফোরণের শব্দ অনেকের কাছেই আশানুরূপ মনে হয় নি।

পঁচাত্তর মিনিট পর 'মাউন্ট ম্যাক্‌কিনলি' জাহাজ ধীরে ধীরে প্রবাল বলয়ের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। বিস্ফোরণের তিন ঘন্টা পর কয়েকজন বিজ্ঞানী তেজস্ক্রিয়া মাপার জন্য গাইগার কাউন্টার ও নানা রকম বিশেষ সুরক্ষামূলক পোশাক পরে নৌকায় করে হ্রদের দিকে এগিয়ে চললেন। লক্ষ্যবস্তু থেকে অনেক দূরে থেকেই তাঁরা জানালেনঃ

সমুদ্র এখনো অত্যন্ত বিপজ্জনক—পানি তেজস্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। মূল কেন্দ্রের জাহাজে গিয়ে উঠতে অন্তত আরো কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ৫টি জাহাজ ডুবেছে অথবা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৯টি, ৫টি মাঝারি রকম আর ৪০টি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অধ্যক্ষ ক্যাণ্ডি যদিও বললেন, 'আমাদের এই পরীক্ষা আনুষ্ঠানিক দিক দিয়ে পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত,' অনেকে বললেন এটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগ উল্লাসের সঙ্গে ঘোষণা করল আগামী পারমাণবিক যুগেও বর্তমানের বড় বড় বাহিনী, যুদ্ধজাহাজ বা অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার বাতিল করা যাবে না—এটাই এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। নৌ-বহর যদি খোলা সমুদ্রে থাকত আর উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারত তাহলে ক্ষতির পরিমাণ হত খুবই সামান্য।

তবে মনে রাখতে হবে যে, শুধু লোহার জাহাজ নিয়ে নৌবাহিনী তৈরি হয় না। জাহাজে মূল্যবান জিনিসপত্র থাকে, ইঞ্জিন-কলকব্জা থাকে, দাহ্য পদার্থ থাকে—আর সবচেয়ে যা বড় কথা, মানুষ থাকে। এসব যদি নষ্ট হল, তা হলে আর নৌবাহিনীর অস্তিত্ব রইল কোথায়?

বিকিনির বোমা নাগাসাকিতে ফেলা বোমার সমপর্যায়ের। কোনও কারণে এর বিস্ফোরণ নাকি নির্দিষ্ট সময়ের তিন সেকেণ্ড আগে হয়েছে। তার অর্থ, নাগাসাকিতে যে উচ্চতায় বোমা ফেটেছিল এখানে ফেটেছে তার চারগুণ উঁচুতে অর্থাৎ মাঝপথে। এজন্য এর প্রভাব বেশিরভাগ ছড়িয়ে পড়েছে ওপরের দিকে। এটাও ক্ষতি অল্প হবার একটা কারণ।

কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, বিস্ফোরণের সময় তাপের সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় ১০ কোটি ডিগ্রি। এত উত্তাপে সব ধাতু গলে যাওয়ার কথা; কিন্তু অ্যাডমিরাল সোলেবার্গ বলছেনঃ কোনও জাহাজের ধাতু গলে যেতে দেখা যায় নি।

মারাত্মক তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন মরণ-মেঘকে মক্ষিকা-বিমান দিয়ে মাত্র এগার কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত অনুসরণ করা গিয়েছে—নাগাসাকিতে দৃষ্ট মেঘের উচ্চতার অর্ধেক মাত্র। তারপর এরা কোথায় অদৃশ্য হয় গেল, সে রহস্যের সমাধান পাওয়া যায় নি।

আর একটা জিনিস অতি সাধারণ লোকের কাছেও খুব আশ্চর্যজনক ঠেকেছে। এই পরীক্ষা পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম বোমার পরীক্ষা; কিন্তু বিস্ফোরণের ধূম্রজাল যখন অপসারিত হল তখন দেখা গেল, বিকিনির উপকূলে তাল নারকেলের সারি অক্ষত রয়েছে—বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে তারা আন্দোলিত হচ্ছে।...পেন্‌সাকোলা জাহাজে ছাগলগুলো নিশ্চিন্ত আরামে ঘাস চিবুচ্ছে।

এ জিনিসটা সকলের পক্ষে বোঝা সহজ নয়। তাই এই খবর শুনে অনেকে জীবদেহের ওপর পরমাণু-বোমার মারণক্ষমতাকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা যত সোজা মনে হচ্ছে, এর মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে তেমনি ভয়ঙ্কর।

পরমাণু-বোমার ক্ষতি হয় প্রধানত তিনভাবে। প্রথমত, মূল বিস্ফোরণের সংঘাত (blast)। দ্বিতীয়ত তাপ-রশ্মির প্রভাব, যাতে নিকটবর্তী সবকিছুতেই আগুন ধরে যায়। আর তৃতীয় হচ্ছে, সূক্ষ্ম, শক্তিশালী রশ্মির আক্রমণ—এদের বলা হয় গামা-রশ্মি।

বিস্ফোরণের পর নিমেষের মধ্যে তীব্র তেজের ঝলকানিতে অনেক দূরের জিনিস পর্যন্ত পুড়ে যায়। প্রায় দেড় কিলোমিটারের মধ্যে খালি-গা মানুষের চামড়া পুড়ে বাদামি বা কাল রঙের হয়ে যায়; এসব লোক মারা যায় কয়েক মিনিট অথবা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই। দু'কিলোমিটার পর্যন্ত মানুষের শরীর অল্প ঝলসে যায়।

বহু আগুন অবশ্য গৌণ কারণেও উৎপন্ন হয়—যেমন, গ্যাস অথবা ইলেকট্রিকের লীক থেকে; তবে তাপ-রশ্মিতেও দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত আগুন ধরে যায়।

তেজস্ক্রিয়ার ক্ষতির মধ্যে গামা-রশ্মির প্রভাব বড় মারাত্মক। এরা দেহের চামড়ার ভেতর দিয়ে চলে যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোনও কুফল দেখতে পাওয়া যায় না। চব্বিশ ঘন্টা পর অস্বস্তিভাব, বমি এবং জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, মাথার চুল পড়ে যেতে থাকে। তিন সপ্তাহ পর মৃত্যুর হার সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়।

এই গামা-রশ্মি হাড়ের মজ্জাকে আক্রমণ করে; নতুন রক্ত-কণিকা আর তৈরি হতে পারে না। এভাবে দেহের লোহিত ও শ্বেত রক্ত-কণিকা কমে গেলে আপনা আপনি রোগীর মৃত্যুর পথ তৈরি হয়। গামা-রশ্মি সব রকমের দেয়ালকে ভেদ করে যেতে পারে। বিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত এর প্রভাব থাকে।

এই পরীক্ষার প্রায় এক বছর আগে, ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা শহরে প্রথম পরমাণু-বোমা ফেটেছিল প্রায় ২৫ বর্গ কিলোমিটার কাঠের ঘরবাড়ির ওপর—তা' থেকে বিস্ফোরণে ও আগুনে ধ্বংস হয়েছিল প্রায় ১০ বর্গকিলোমিটার। সেখানকার ৩ লক্ষ ২০ হাজার লোকের মধ্যে মারা গিয়েছিল প্রায় এক লক্ষ।

এর পরই নাগাসাকিতে বোমা পড়ে ৯ আগস্ট; একটি উপত্যকার আড়াই বর্গ কিলোমিটার এলাকার শিল্প-কারখানা এতে বিনষ্ট হয়েছে। এখানে প্রায় ৮০ হাজার মানুষ মারা যায়। জাপানের ওপর পরমাণু-বোমার ফলাফল সম্বন্ধে এই খবরগুলো খুব অল্পদিন হল প্রকাশ পেয়েছে, একটি ব্রিটিশ মিশনের বহুদিন ধরে অনুসন্ধানের পর। তাঁরা মন্তব্য করেছেনঃ এই দু'টি শহরই এক সময় ছিল উন্নতিশীল এবং জনাকীর্ণ; কিন্তু আজ এরা অন্ধকারের অতল গহ্বরে ডুবে গিয়েছে।

এই হচ্ছে ভয়ঙ্কর পরমাণু - বোমার বিস্ফোরণের প্রকৃত স্বরূপ। আমেরিকা আজ পরমাণু-বোমাকে আরো নিখুঁত করবার চেষ্টায় মেতে উঠেছে, কিন্তু এর ফল হবে একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মানুষের অনেক আদরের, জনৈক গৌরবের এই গগনস্পর্শী সভ্যতার সম্পূর্ণ বিলোপ—মানুষের সভ্যতার অপমৃত্যু।

[১৩৫৩/১৯৪৬]

হাইড্রোজেন – বোমা

খবর রটেছেঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের এনিওয়েটক প্রবালদ্বীপে সাফল্যের সঙ্গে হাইড্রোজেন–বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে; আর সেই বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় সমগ্র দ্বীপটি হাওয়া হয়ে উবে গিয়েছে। একটি বিখ্যাত সংবাদ সংস্থা এমন কি একে বছরের (১৯৫২) পাঁচটি সেরা সংবাদের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

খবরটাকে যাঁরা সন্দেহের চোখে দেখছেন তাঁদের কারো কারো মতে এটা আমেরিকার ঠাণ্ডা–যুদ্ধের একটা চালমাত্র। প্রথমদিকে চলছিল পরমাণু–বোমার হুমকি। কিন্তু রাশিয়া যখন পর পর কতকগুলো পরমাণু–বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলল এবং নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত ব্রিটিশ পরমাণু–বিজ্ঞানী পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট যখন প্রচুর যুক্তিতথ্যের সমাবেশ করে দেখিয়ে দিলেন যে, প্রচণ্ড ধ্বংস–ক্ষমতা সত্ত্বেও পরমাণু–বোমা কোনমতেই যুদ্ধ জয়ের চূড়ান্ত অস্ত্র বলে গণ্য হতে পারে না, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি–কৌলীন্যের গর্ব পেরেক–ঠোকা বেলুনের মতো চুপসে গেল। তাই আজ তার হাইড্রোজেন–বোমার হুমকির প্রয়োজন।

১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে গত সাত বছরে দুনিয়াজোড়া অস্ত্রসজ্জা আর স্নায়ু–যুদ্ধের ডামাডোলে হাইড্রোজেন–বোমার কথা এত শোনা গিয়াছে যে, এটা আজ কারো কাছেই নতুন বা চমকপ্রদ কিছু নয়। জানা গিয়েছে, নক্ষত্ররাজি যে প্রচণ্ড তেজে বহু কোটি বছরে ধরে দীপ্তিমান, সূর্যের যে তেজের কণামাত্র অংশ নিয়ে পৃথিবীর বুকে প্রাণের সমারোহ—যার মূল কথা তাপকেন্দ্রীন সংঘর্ষের ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুর হিলিয়ামের পরমাণুতে রূপান্তর—হাইড্রোজেন বোমা বা 'অতি–বোমা' সৃষ্টির মাধ্যমে সেই প্রচন্ড শক্তিকে মানুষ আজ আয়ত্ত করার পথে।

মূল কথাটা জানা ছিল অনেক আগেই। তবে তার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধেই ছিল বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা সংশয়। ১৯৫০ সালের ৩১ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ট্রুমান যখন পরমাণু–শক্তি কমিশনকে হাইড্রোজেন–বোমা তৈরির কাজ শুরু করতে নির্দেশ দেন, তখনই বোঝা গেল, বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে এই বোমা তৈরির সম্ভাবনা সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছেন। কয়েক মাসের মধ্যেই পাকাপাকি পরিকল্পনা রচনা করা হল। বোমা তৈরির জন্য তখনকার মতো বরাদ্দ হল সোয়াশ' কোটি ডলার।

সচরাচর যাকে পরমাণু–বোমা বলা হয় (আসলে যা ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম বোমা) তাতে বিস্ফোরণের মূল কথা হচ্ছে বীজ–ভঙ্গ (fission)। ইউরেনিয়াম–২৩৫

বা প্লুটোনিয়াম পরমাণুকেন্দ্রকে যখন নিউট্রন কণার ছটরা দিয়ে আঘাত করা হয় তখন পরমাণুকেন্দ্র ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে যায়; কিন্তু এই ভাঙ্গা টুকরো দু'টির ওজন একত্র করলে হয় আসল পরমাণুর চেয়ে সামান্য কম। মাঝখান থেকে হারিয়ে যাওয়া এই বস্তুমাত্রাই রূপান্তরিত হয় শক্তিতে।

বিশের দশকের শেষে পদার্থবিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন, নক্ষত্রের বুকে প্রচণ্ড শক্তির উৎস যে পারমাণবিক বিক্রিয়া, সেটা ঠিক এর উলটো। তাকে বীজভঙ্গ না বলে বীজ-সংযোগ (fusion) বলা যেতে পারে। এতে প্রচণ্ড তাপে ও চাপে হাইড্রোজেনের পরমাণু জুড়ে গিয়ে সৃষ্টি হয় হিলিয়ামের পরমাণু। কিন্তু এখানেও এই যোগফলের মধ্যে খানিকটা বস্তু হারিয়ে যায়—আর তা পরিণত হয় শক্তিতে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন তাপকেন্দ্রীন বিক্রিয়া (Thermonuclear Reaction)। আইনস্টাইনের সমীকরণ অনুসারেঃ শক্তি=বস্তু x আলোর বেগের বর্গ। আলোর বেগ সেকেন্ডে প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার। এতেই অতি সামান্য পরিমাণ বস্তু থেকে যে কী বিপুল শক্তি পাওয়া সম্ভব তা বোঝা যাবে।

নক্ষত্রের বুকে অনবরত হাইড্রোজেন জ্বলছে—হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হচ্ছে হিলিয়ামে। এই হচ্ছে নক্ষত্রের অফুরন্ত শক্তির রহস্য। সূর্যের বস্তুপুঞ্জের তহবিলের শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগই হাইড্রোজেন। সূর্য এখন যে-হারে জ্বলছে এভাবে জ্বলে জ্বলেও তার হাইড্রোজেনের পুঁজি ফুরোতে আরো বহু কোটি বছর সময় নেবে।

অবশ্য এই যে হাইড্রোজেন জ্বলার কথা হচ্ছে, এ-হাইড্রোজেন সাধারণ হাইড্রোজেন নয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, হাইড্রোজেন আছে তিন জাতের—ভরের অনুপাত অনুসারে তাদের ১, ২, ৩ এই তিনটি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। হাইড্রোজেন-১ অর্থাৎ সাধারণ হালকা হাইড্রোজেন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু হাইড্রোজেন-২ বা ভারি হাইড্রোজেন অতি দুষ্প্রাপ্য। একটি হাইড্রোজেন এবং দু'টি অকসিজেন মিলে যদি পানি তৈরি হয় তবে তাকে 'ভারি পানি' (heavy water) বলা যেতে পারে। সাধারণ পানিতে এই ভারি পানির অনুপাত হচ্ছে ৫,০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

হাইড্রোজেন-২-কে বিজ্ঞানীদের ভাষায় ডয়টেরিয়াম (Deuterium) এবং এর পরমাণু-কেন্দ্রকে ডয়টেরন (Deuteron) বলা হয়। প্রচণ্ড গতিশীল দু'টি ডয়টেরন কণার যখন সংঘর্ষ ঘটে তখন জন্ম নেয় একটি হিলিয়াম পরমাণু আর একটি নিউট্রন কণা। সঙ্গে সঙ্গে যে অতি প্রচুর শক্তি উদ্ভব হয়, সেকথা বলাই বাহুল্য।

এই জন্ম কাহিনীকে বিজ্ঞানীদের সাংকেতিক ভাষায় লেখা হয় এভাবেঃ

$$\text{ড}^{২}_{১} + \text{ড}^{২}_{১} = \text{হি}^{৩}_{২} + \text{নিউট্রন}^{১}_{০}$$

নিচের সংখ্যাটি পরমাণুর ক্রমিক সংখ্যা, ওপরেরটি আপেক্ষিক ভর। ক্রমিক সংখ্যার দিক দিয়ে হাইড্রোজেনের স্থান প্রথম (ডয়টেরন = হাইড্রোজেন-২),

হিলিয়ামের দ্বিতীয়। সাধারণ হিলিয়াম পরমাণুর ভর ৪; কিন্তু এখানে ৩ ভরের যে হিলিয়াম সৃষ্টি হয়েছে তাকে সমস্থানিক (isotope) হিলিয়াম বলা হয়। নিউট্রনের ভর ১, কিন্তু তার বৈদ্যুতিক আধান শূন্য।

গবেষণাগারে সাইক্লোট্রন যন্ত্রের প্রচন্ড বেগশালী ডয়টেরন কণা দিয়ে ওপরের বিক্রিয়া ঘটানো যায়। কিন্তু ব্যাপক আকারে এই বিক্রিয়া ঘটাবার জন্য প্রায় ৮ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপের প্রয়োজন। পৃথিবীতে এই পরিমাণ তাপ সৃষ্টি পরমাণু-বোমা তৈরি হবার আগে পর্যন্ত ছিল অসাধ্য ; কেননা এক লক্ষ ডিগ্রিতে পৌছবার অনেক আগেই সমস্ত ফার্ণেস বাষ্প হয়ে উবে যায়। সূর্যের ভেতরের উষ্ণতা প্রায় দু'কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েই কেবল এই তাপমাত্রা পাওয়া যেতে পারে।

কাজেই হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করার জন্য প্রধানত দু'টি জিনিস দরকার—ভারি হাইড্রোজেন বা ভারি পানি এবং বিক্রিয়া ঘটাবার জন্য একটি পরমাণু-বোমা। যথেষ্ট পরিমাণে ভারি পানি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য এবং ব্যয়বহুল।

এছাড়া আরেকটি নাম এই প্রসঙ্গে বেশি করে শোনা যাচ্ছে—সেটা হল হাইড্রোজেন ৩ বা ট্রাইটিয়াম (Tritium)। ডয়টেরন-ডয়টেরন সংঘর্ষ থেকে হিলিয়ামের সঙ্গে অল্প পরিমাণে ট্রাইটিয়ামও তৈরি হয় ঃ

$$\text{ড}^{২}_{১} + \text{ড}^{২}_{১} = \text{ট্রাইটিয়াম}^{৩}_{১} + \text{হাইড্রোজেন}^{১}_{১}$$

তাছাড়া লিথিয়াম ধাতুকে নিউট্রন কণা দিয়ে আঘাত করেও হিলিয়াম এবং ট্রাইটিয়াম পাওয়া যায়। আবার ট্রাইটিয়ামের সঙ্গে সাধারণ হাইড্রোজেন কেন্দ্রক বা লিথিয়াম কেন্দ্রকের সংঘর্ষ ঘটিয়েও হিলিয়াম সৃষ্টি করা যেতে পারে।

ডয়টেরন, ট্রাইটিয়াম এবং লিথিয়াম—এর কোন্ কোন্‌টি (অথবা সবগুলিই) হাইড্রোজেন বোমা তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে তা এখনো সুনিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে হাইড্রোজেন বোমার জন্য যেহেতু একটি সাধারণ পরমাণু-বোমা ব্যবহারের অপরিহার্যতা রয়েছে, কাজেই নানা জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যোগ করে এর ওজন বা আয়তন যে কোন ক্রমেই ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম বোমার চেয়ে কম হবে না, একথা বেশ নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলা যায়। সাধারণ পরমাণু-বোমার ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের দু'টি বিচ্ছিন্ন খণ্ডকে এক বিশেষ মুহূর্তে একত্র করলে যখন সংকট আয়তনে (critical mass) পৌছায় তখনই বিস্ফোরণ শুরু হয়। কাজেই পরমাণু-বোমাকে এই সংকট আয়তনের চেয়ে বড় করা চলে না। অথচ হাইড্রোজেন বোমার সে-রকম কোন সীমাবদ্ধতা নেই; যত খুশি 'দাহ্য পদার্থ' জড়ো করে এর আকার এবং ধ্বংসক্ষমতা বাড়ানো যেতে পারে ।

নাগাসাকিতে যে প্লুটোনিয়াম বোমা ফেলা হয়েছিল, বিজ্ঞানীরা বলছেন তার বিস্ফোরণ ছিল ২০,০০০ টন টি-এন-টি'র বিস্ফোরণের সমান। অনুমান করা হচ্ছে,

হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ দু'লক্ষ থেকে দশ লক্ষ টন টি-এন-টি'র বিস্ফোরণের সমান হতে পারে। হিরোশিমার প্রথম বোমাটি চারদিকে দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় (অর্থাৎ দেড় কিলোমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে) ধ্বংস বিস্তার করেছিল; পরবর্তী উন্নত ধরনের পরমাণু-বোমার ধ্বংস-ক্ষমতা হল চারদিকে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত। হাইড্রোজেন বোমা সম্ভবত চতুর্দিকে পনের কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে ধ্বংসকাণ্ড ঘটাতে পারবে।

তাছাড়া সাধারণ পরমাণু-বোমার যে বিস্ফোরণ প্রক্রিয়া, অর্থাৎ 'বীজভঙ্গ', তাকে নিয়ন্ত্রিত করে শান্তিকালীন কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু হাইড্রোজেন-বোমার প্রক্রিয়া 'বীজ-সংযোগ'কে সেভাবে নিয়ন্ত্রিত করার কোন সম্ভাবনা নেই। নিমেষের মধ্যে প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসকাণ্ড ঘটানোই তার একমাত্র কাজ। অর্থাৎ এটা নেহাতই শুধু 'বোমা'—এবং যুদ্ধের মারণাস্ত্র।

হাইড্রোজেন-বোমা সাধারণ পরমাণু-বোমার চেয়ে বহুগুণে বেশি মারাত্মক বলেই সব ধরনের পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নও আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। আমেরিকার নেতৃস্থানীয় পদার্থবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দাবী করেছেন যে, শত্রুপক্ষ যদি আগে আমেরিকার বিরুদ্ধে হাইড্রোজেন-বোমা প্রয়োগ না করে, তাহলে এই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না।

প্রথম পরমাণু-বোমা তৈরি হবার পর আইনস্টাইনের নেতৃত্বে আমেরিকার ৪০ জন শ্রেষ্ঠ পরমাণু-বিজ্ঞানী অন্তত মানবতার খাতিরে এই ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র প্রয়োগ না করবার অনুরোধ জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে এক সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু জাপানের ওপর পরমাণু-বোমা ফেলার সময় তাঁদের সে অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা করা হয় নি। এবারেও যে রক্ষা করা হবে তার নিশ্চয়তা কিছু নেই।

সাত বছর আগের চাইতে পরমাণু অস্ত্র এবং যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে জনমত আজ অনেক বেশি সচেতন, অনেক বেশি তীব্র। এমন কি খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের মধ্যেও ব্যাপক মারণায়োজনের স্বার্থে মানুষের কল্যাণকর বিজ্ঞানকে শৃঙ্খলিত করার বিরুদ্ধে, পরমাণু-অস্ত্রের 'অর্থহীন প্রচন্ডতার' বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের মনোভাব গড়ে উঠছে। রবার্ট ওপেনহাইমার প্রমুখ সেরা পরমাণু-বিজ্ঞানীরা এই 'অর্থহীন ভয়াবহতার' জন্য গোড়া থেকেই হাইড্রোজেন-বোমা তৈরির পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছেন।

ব্রিটিশ বিজ্ঞান-কর্মীরা আরো সংগঠিতভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ব্রিটেনের জাতীয় বিজ্ঞানকর্মী সংঘের গত বার্ষিক সম্মেলনে সব রকম পরমাণু-অস্ত্র বেআইনী করার এবং প্রথম পরমাণু-অস্ত্র প্রয়োগকারী রাষ্ট্রকে মানবতাদ্রোহী বলে ঘোষণা করার দাবী জানানো হয়েছে।

বলাবাহুল্য, শেষ পর্যন্ত জনমতের সক্রিয় অভিব্যক্তিই হাইড্রোজেন-বোমার বিরুদ্ধে একমাত্র রক্ষাকবচ।

[১৩৫৯/১৯৫২]

জীবন ও মৃত্যু

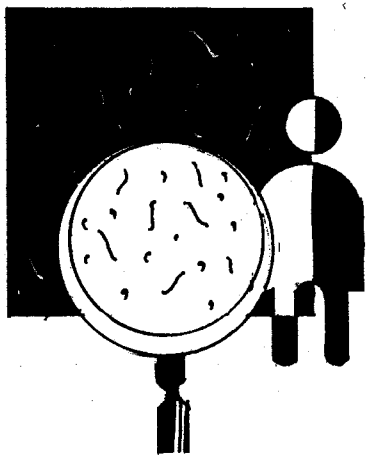

খাদ্যে প্রোটিনের সমস্যা

আমাদের প্রত্যেকের দেহ নানা ধরনের কোটি কোটি জীবকোষ দিয়ে তৈরি। আর এসব জীবকোষের প্রধান উপাদান হল প্রোটিন বা আমিষ। প্রোটিন কথাটার উৎপত্তি যে গ্রীক শব্দ থেকে, তারও অর্থ হল 'সবার আগে যার স্থান'। এক কথায় প্রোটিন হল জীবদেহের আদি প্রাণবস্তু।

স্কুলের বইতে লেখা থাকে, প্রোটিনজাতীয় খাদ্য উপাদান আমাদের দেহের দৈনন্দিন ক্ষয় পূরণ করে, দেহ গঠন করে এবং রোগ-ব্যাধির আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে। খাদ্যে প্রোটিনের অভাব ঘটলে শারীরিক বা মানসিক যে কোন ধরনের শ্রমের কাজে উদ্যমহীনতা দেখা দেয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় দেহ নানা রোগে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত প্রোটিনের অভাব জনসাধারণের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়ে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

আদতে এমনি গুরুতর প্রোটিনের অভাব আজ আমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে। মাথাপিছু দৈনিক যেটুকু প্রোটিন না হলে নয়, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আজ পাচ্ছে তার মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ। আবার এর মধ্যে উন্নত জাতের প্রাণিজ প্রোটিন যা দেহ সহজে আত্মস্থ করতে পারে—তা রয়েছে অতি সামান্য ভগ্নাংশ। বিলেতে একজন সাধারণ মানুষ দৈনিক গড়পড়তা প্রোটিন পায় ৮৮ গ্রাম (প্রায় দেড় ছটাক) আর তার শতকরা ৬১ ভাগই হল প্রাণিজ। অথচ বাংলাদেশের গড়পড়তা মাথাপিছু দৈনিক প্রোটিন গ্রহণের হার মাত্র ৫৭ গ্রাম (প্রায় এক ছটাক) আর তার মাত্রই শতকরা ১৩ ভাগ হল প্রাণিজ, বাকি সবটা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন।[১] অথচ বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রোটিন খাদ্যের অন্তত অর্ধেকটা হওয়া দরকার প্রাণিজ প্রোটিন।

১৯৬৫ সালে এদেশে প্রোটিন সরবরাহ ও চাহিদা সম্বন্ধ একটি জরিপ চালানো হয়। এই জরিপ থেকে দেখা যায়, প্রোটিনের সব চাইতে বেশি ঘাটতি ঘটছে বাড়ন্ত বয়সের শিশু, অন্তঃসত্ত্বা ও প্রসূতি নারী, গ্রামবাসী ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। শহরের লোকের তুলনায় গ্রামের লোকের এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণীর তুলনায় নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্য অর্থনৈতিক কারণে প্রোটিনের বেশি ঘাটতি ঘটবে, এটা সহজেই বোঝা যায়। শিশু ও গর্ভবতী মেয়েদের প্রোটিনের চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু পরিবারের সামান্য আয়ে যেটুকু প্রোটিন খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তার সিংহভাগ যায় উপার্জনক্ষম পুরুষের পাতে। এ অবস্থাটা জাতির ভবিষ্যতের জন্য মারাত্মক। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শৈশবে গুরুতর প্রোটিন ঘাটতির ফলে স্থায়ী মানসিক অপরিপক্কতা ঘটতে

[১] নব্বইয়ের দশকে এই হার বাড়ে নি, বরং আরো কমেছে।

পারে।

প্রোটিন ঘাটতির একটি প্রত্যক্ষ ফল হল ব্যাপকহারে শিশুমৃত্যু। বাংলাদেশে প্রায় প্রতি পাঁচজনে একজন শিশু পাঁচ বছর বয়স হবার আগেই নানা রোগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ইউরোপে এই হার প্রায় প্রতি পঞ্চাশজনে একজন। আমাদের যে-সব শিশু মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে যায়, তাদেরও অধিকাংশই হয় ভগ্নস্বাস্থ্য, ক্ষীণদেহ। জন্মের সময় থেকে প্রায় ন'মাস বয়স পর্যন্ত এদেশের শিশু আর ইউরোপীয় শিশুর মধ্যে দৈর্ঘ্য বা ওজনের তফাত থাকে অতি সামান্য; কিন্তু ন'মাস থেকে চব্বিশ মাস বয়সের মধ্যে আকার ও ওজনে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা দেয়। খাদ্য-পুষ্টির উন্নতি ঘটলে যে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে একটি জাতির গড়পড়তা উচ্চতা কতখানি বাড়তে পারে, তরুণ জাপান তার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

পুষ্টিবিজ্ঞানীরা বলছেন, আমাদের দেশে শুধু যে প্রোটিনের ঘাটতি রয়েছে তাই নয়, এই ঘাটতির পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং সে অনুপাতে প্রোটিন সরবরাহ বৃদ্ধির হারের শম্বুকগতিই এর প্রধান কারণ। ১৯৬৫ সালে হিসেব করা হয়েছিল, সারা দেশের জন্য বছরে যত প্রোটিন দরকার, সরবরাহ হচ্ছে তার মাত্র ৮৫ শতাংশ। বিশ শতকের শেষ দশকে জনসংখ্যা হবে প্রায় দ্বিগুণ। আর বর্তমান অবস্থা যদি চলতে থাকে, তাহলে তখন প্রোটিনের ঘাটতি বেড়ে হবে ১৯৬৫-এর তুলনায় পাঁচগুণ বেশি।

বলাবাহুল্য, অবস্থাটা সন্তোষজনক তো নয়ই, বরং রীতিমতো ভীতিজনক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা এ অবস্থার একটি সমাধান অবশ্যই। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিন খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো এবং দেশে যে-সব প্রোটিন খাদ্যের উৎস রয়েছে তার যথাযথ সদ্ব্যবহার আশু প্রয়োজন।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে তেমন চারণক্ষেত্র না থাকায় দুধ আর মাংসের অভাব। এদেশে প্রাণিজ প্রোটিনের প্রধান উৎস হল মাছ। নদী-নালা-পুকুর প্রভৃতি নানা উৎস থেকে আমরা প্রতি বছর প্রায় আট লাখ টন মাছ পাই। দুধ যা পাওয়া যায়, তাও ওজনের দিক দিয়ে এর প্রায় সমান; কিন্তু মাংস পাওয়া যায় মাছের ওজনের মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ। আবার মাছ যে পরিমাণে পাওয়া যায়, তারও শতকরা প্রায় দশভাগ নষ্ট হয় সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটি আর সংরক্ষণের অভাবে। মাছের উৎপাদন বাড়ানো যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন এই অপচয় রোধ করা।

বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, মানুষের দেহের জন্য যেসব নানা ধরনের প্রোটিনজাতীয় উপাদান (অ্যামাইনো অ্যাসিড) প্রয়োজন, তা সুসমঞ্জস ও সহজপাচ্য অবস্থায় পাওয়া যায় প্রাণিজ প্রোটিনে (ডিম, দুধ, মাছ, মাংস)। ডাল ও অন্যান্য শিমজাতীয় উদ্ভিদেও যথেষ্ট প্রোটিন রয়েছে, কিন্তু তাতে আমাদের প্রয়োজনীয় সব প্রোটিন উপাদান সুসমঞ্জস অনুপাতে পাওয়া যায় না।চালে প্রোটিন রয়েছে শতকরা ৭

ভাগ, গমে রয়েছে প্রায় ১১ ভাগ। কিন্তু এই দু'জাতের শস্যেই আমাদের দেহের জন্য অতি প্রয়োজনীয় 'লাইসিন' নামে অ্যামাইনো অ্যাসিডের ঘাটতি রয়েছে।

প্রাণিজ প্রোটিনের মধ্যে আবার মাছের একটা বিশেষ সুবিধে এই যে, এর উৎপাদন সবচাইতে কম ব্যয়বহুল। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, পশু পালনের সাহায্যে এক সের মাংস উৎপাদন করতে হলে অন্তত দশ সের উদ্ভিজ্জ খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন। এই উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য জমি, সার এসবের সমস্যা আছে। অথচ মাছের জন্য অতিরিক্ত জমি বরাদ্দ, সার প্রয়োগ এসবের ঝামেলা নেই। এক হিসেবে দেখতে গেলে মাছ প্রায় আপনা-আপনি পাওয়া যায়। অথচ বাংলাদেশের প্রায় পাঁচশ' কিলোমিটার সমুদ্র উপকূলে যে বিপুল পরিমাণ মাছ ধরার সুযোগ রয়েছে, তার আমরা সদ্ব্যবহার করছি না।

প্রোটিন খাদ্যের—আদতে যে-কোন ধরনের খাদ্যেরই—উৎপাদন বাড়াবার ব্যাপারে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। আমাদের মতো জনবহুল দেশে চাষের জমির পরিমাণ যেমন সীমাবদ্ধ, তেমনি সীমাবদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণও। অথচ জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়তির মুখে। এ অবস্থায় উৎপাদন বাড়াবার একমাত্র নিশ্চিত পন্থা হল যে জমি বা জলাশয় আমাদের হাতে আছে, তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করা; আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত উৎকর্ষ বাড়ানো; উৎপন্ন খাদ্যের উপযুক্ত সংরক্ষণ ও সবচেয়ে ভাল ব্যবহার; আজ ব্যবহৃত হচ্ছে না এমন নতুন নতুন পুষ্টিদায়ক উপাদানের ব্যবহার।

মাছ সাধারণত যেখানে ধরা হয়, সেখানেই তার ব্যবহার হয় না। অথচ ধীরগতি নৌযান ব্যবস্থায় বাজারে নিতে নিতে মাছ পচতে শুরু করে। এজন্য দ্রুতগতি নৌযান এবং বরফ দিয়ে বা হিমায়ন ব্যবস্থায় মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা দরকার। সারা বছর মাছ একই হারে পাওয়া যায় না। এজন্য মশলা সংযোগে, শুকিয়ে বা টিনজাত করে মাছের সংরক্ষণ হতে পারে। বলাবাহুল্য, এজন্য বিজ্ঞাননির্ভর খাদ্যশিল্প স্থাপন প্রয়োজন। যেসব মাছ খেতে তেমন সুস্বাদু নয় বা খেতে আমরা অভ্যস্ত নই, সেগুলো থেকে উচ্চ প্রোটিনসম্পন্ন মাছের ময়দা তৈরি হতে পারে। এই ময়দা খুব সামান্য পরিমাণে রুটির ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে খাদ্যে প্রোটিনের অভাব অনেকখানি দূর করা যেতে পারে। এছাড়া মাছের অব্যবহার্য অংশ—যেমন মাথা, নাড়িভুঁড়ি, লেজ প্রভৃতি পশুপাখির খাদ্য হিসেবে 'ফিশমিল' তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। তেমনি মাছের আঁশ থেকে জিলেটিন তৈরি হতে পারে।

আসলে প্রোটিনের পরিমাণের দিক দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ডাল ও শিমজাতীয় ফসল মাছের চেয়ে কিছু কম যায় না। উভয় ক্ষেত্রেই প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ২২ থেকে ২৫ ভাগ। আগেই বলা হয়েছে, প্রাণিজ প্রোটিনে বিভিন্ন প্রোটিন উপাদান (অ্যামাইনো অ্যাসিড) রয়েছে অধিকতর সুসমঞ্জস মাত্রায়; কিন্তু মাছ-মাংসের চেয়ে ডাল ও শিমজাতীয় ফসলের দাম অনেক কম, সংরক্ষণও অতি সহজ। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রোটিনের

এই গুরুত্বপূর্ণ উৎস ডাল ও শিমের ব্যবহার বাংলাদেশে যথেষ্ট নয়। সব রকম উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে ডাল আর শিমেই প্রোটিনের অনুপাত সবচাইতে বেশি। আমাদের জনসাধারণ এই স্বল্পমূল্য অথচ প্রোটিনবহুল খাদ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হলে হয়তো এই সহজলভ্য ফসলগুলোর উৎপাদন আরো বাড়বে।

আদতে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সমস্যা হল আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ। আমাদের কৃষিব্যবস্থা যেমন অতি প্রাচীন, তেমনি পশ্চাদপদ আমাদের মাছ ধরার বা পশুপালনের ব্যবস্থা। অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের ফসলের ফলন একর প্রতি মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। বীজ নির্বাচন, জমিতে চাষ দেওয়া, সার প্রয়োগ, ক্ষতিকর কীট ধ্বংস করা, ফসল সংরক্ষণ প্রভৃতিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের অভাবই এর কারণ। আমাদের গৃহপালিত পশুপাখি বিদেশের তুলনায় আকারে অনেক ছোট, ফলে তা থেকে দুধ-ডিম বা মাংসও পাওয়া যায় অনেক কম। মাছ ধরা হয় আমাদের দেশে সেই আদিম পন্থায়। সমুদ্রে মাছের বিশাল ভান্ডারকে ব্যবহার করার খুব সামান্য চেষ্টাই আমরা করছি।

সম্প্রতি শস্য প্রজননের ক্ষেত্রে গবেষণার ফলে নানা নতুন নতুন জাতের ধান ও গমের উদ্ভব হয়েছে। কোন কোন জাতের ইরি ধান থেকে আমাদের দেশের সাধারণ জমিতেও অন্য চলতি জাতের তুলনায় দু'তিনগুণ ফসল পাওয়া যাচ্ছে। এভাবে সাধারণ ধান বা গমের তুলনায় অধিকতর প্রোটিনযুক্ত উন্নত জাতের ধান ও গম সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। অদূর ভবিষ্যতে যে এই চেষ্টা সফল হবে, এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মনে কোন সংশয় নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রোটিন-সমস্যা গুরুতর হলেও এর সমাধান সম্ভব। এজন্য দরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের সাহায্যে খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো; জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ; খাদ্যশিল্পের বিস্তার; জনসাধারণের খাদ্যের অভ্যাস বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের খাদ্যসম্পদের সুষম বন্টন। এ সমস্যার সমাধান শুধু সম্ভব নয়, আশু প্রয়োজন। তা না হলে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি হবে সুদূরপরাহত।

[১৩৭৬/১৯৬৯]

জীবাণু ও মানুষ

আজ প্রায় সবাই জানে, জীবাণু থেকে রোগ হয়। কিন্তু তাই বলে বছরের কোন বিশেষ সময়ে যদি দেশের নানা জায়গায় কলেরা-ডায়রিয়ার মহামারী দেখা দেয়, গাঁয়ের পর গাঁ মড়ক লেগে উজাড় হতে থাকে, তাহলে তার জন্য জীবাণুর ওপর দোষ চাপানোটা কোন কাজের কথা নয়। দোষ যদি কাউকে দিতে হয়, তবে সে দিতে হবে আমাদের নিজেদেরকেই; আমাদেরই অজ্ঞতা, মূঢ়তা, শোচনীয় দারিদ্র্য, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে নির্বিকার ঔদাসীন্য—আর এসবের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা দায়ী, তাদের সবাইকে।

মহামারীকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে মানুষেরই হাতের মুঠোয়—উন্নত, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রা, ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার আর রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থার মধ্যে। মানুষ দেখিয়েছে, বিজ্ঞানের হাতিয়ার নিয়ে ব্যাধিকে জয় করা সম্ভব—মহামারীর হাত থেকে বাঁচার জন্য 'ওলা বিবি' আর 'শীতলা দেবী'র পায়ে মাথা কোটা নিতান্ত বোকামি ছাড়া আর কী! অথচ এই সহজ কথাটা শিখতে মানুষের অনেক সময় লেগেছে।

মানুষের ইতিহাস শুরু হবার পর থেকে দুনিয়াতে মারী আর মড়ক এসেছে কতবার, তার কোন লেখাজোখা নেই। কালমৃত্যু আর ধ্বংসের বিভীষিকা পায়ে পায়ে নিয়ে মারী আর মড়কের আবির্ভাব ঘটেছে বার বার—অনিবার্য নিয়তির মতো। আর বছরের পর বছর ধরে চলেছে তার তান্ডব নৃত্য—দেশের পর দেশ ছারখার করে দিয়েছে। অসহায় মানুষ নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে তার পায়ে—দেবতার অভিশাপ বলে ধিক্কার দিয়েছে নিজের ভাগ্যকে। কখনো বা বাঁচার অনিবার্য তাগিদে দল বেঁধে পালিয়েছে দেশ ছেড়ে। কিন্তু তাতে সমস্যার কোন সুরাহা হয় নি, বরং রোগের বীজ ছড়িয়ে পড়েছে আরো দেশ-দেশান্তরে।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে সভ্যতার সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে মানুষ। বিকাশ ঘটেছে জ্ঞানবিজ্ঞানের। আর এই জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক দেখিয়ে দিয়েছে মারী-মড়ক নেহাৎ আকাশচারী দেবতাদের খেয়ালখুশির ব্যাপার নয়; পৃথিবীর বুকে রয়েছে তার বীজ—আর পৃথিবীর বুকেই লুকিয়ে আছে তার উচ্ছেদেরও মন্ত্র। বিজ্ঞানের আলোক হটিয়ে দিয়েছে অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারের অন্ধকারকে। মারী-মড়ককে মানুষ জয় করেছে।

মহামারীর রাজা হল প্লেগ—এর মতো ভয়াবহ ব্যাধি আর বড় একটা নেই। সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে সারা ইউরোপ জুড়ে প্লেগ বিভীষিকা বিস্তার করেছে। যুদ্ধবিগ্রহে যত লোক মারা গিয়েছে, প্লেগের আক্রমণে মারা গিয়েছে তার চাইতে বেশি। এশিয়া থেকে বাণিজ্য পথ ধরে ধরে এই মড়ক গিয়েছে এশিয়া মাইনরে, বলকানে, উত্তর আফ্রিকায়। এর হাত থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় ছিল না।—'কভিনোস' নামে একজন ঐতিহাসিক লিখেছেনঃ

> প্রচণ্ড গরম বা দুরন্ত শীত এই ভয়ঙ্কর রোগকে কাবু করতে পারে না। এই মড়ক পাহাড়ে লাফিয়ে ওঠে; দ্বীপে, উপত্যকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে—জলা-জঙ্গল-সমুদ্র কিছুই একে ঠেকাতে পারে না। নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ-কুলপতিনির্বিশেষে সবাইকে এই কালমৃত্যুর পায়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে লোকে হয়তো ভাবছে, দানবটা এবার দূর হয়েছে, এমনি সময় হঠাৎ অতর্কিতে মৃত্যু তার কালহাত তুলে ধরবে; প্রথমে হয়তো দূরে, তার পরমুহূর্তে ঠিক তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে মৃত্যু হা-হা করে হাসবে তার অপরাজেয়, উৎকট বীভৎস হাসি।

১৬৬৫ সালে লণ্ডন শহর প্লেগের আক্রমণে প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল—সতের শতকের মধ্যে তার প্রকোপ কমে নি। ১৮৫১ সালের পর ইউরোপে আর তেমন বড় রকমের প্লেগের খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু তার পরও মিসর, আফ্রিকা, মেসপোটেমিয়া, ভারত ও দক্ষিণ চীনে এর প্রচণ্ড তাণ্ডব অব্যাহত থেকেছে। ১৮৯৪ সালে জাপানী চিকিৎসক কিতাসাতো এবং তাঁর ফরাসী সহযোগী ইয়েরসিন প্রথম প্লেগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। ১৮৯৬-৯৭ সালে ভারত আর চীনে ব্যাপক মহামারী দেখা দেবার পর ভেনিসে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের একটি সম্মেলন বসে। সেখানে আন্তর্জাতিকভাবে প্লেগ প্রতিরোধ করার জন্য কতকগুলো সমষ্টিগত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্লেগের টিকাসহ অন্যান্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং উন্নত স্বাস্থ্যবিধির সাহায্যে এই রোগের আক্রমণ আজ সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু প্লেগ তো শুধু একটি মাত্র রোগ। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে যেসব আধি-ব্যাধি যুগে যুগে মানুষের ওপর ধ্বংস আর মড়কের বিভীষিকা বয়ে এনেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে কুষ্ঠ, টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, আমাশয়, পীতজ্বর, যক্ষ্মা—আরো যে কত অগুনতি ব্যাধি, তার হিসেব নিয়ে শেষ করা যাবে না।

বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে পরাধীনতার জোয়ালে আবদ্ধ থাকায় অনগ্রসর যেসব দেশ, সেখানেই যেন সব ব্যাধি দল বেঁধে তাদের মৌরসি আসন গেড়ে বসেছে। যুগ-যুগান্তের শোষণে, অত্যাচারে, আধিতে-ব্যাধিতে জর্জর এসব দেশের মানুষের প্রথম ওষুধ হচ্ছে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা; স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবন গড়ে তোলার অধিকার; জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও শিক্ষার মান বাড়ানো—যাতে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি এবং রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থাকে কার্যকর করা যায়। এসব রোগের মধ্যে একমাত্র কুষ্ঠ ছাড়া আর সবগুলোর সঠিক চিকিৎসা-পদ্ধতি আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। দুনিয়ার বুক থেকে চিরদিনের মতো এদের উচ্ছেদ করার বাস্তব সম্ভাবনা আজ দেখা দিয়েছে।

অবশ্য একদিনেই মানুষ আজকের এই অবস্থায় এসে পৌঁছতে পারে নি। তার জন্য যুগ যুগ ধরে ব্যাধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। শত শত বিজ্ঞানকর্মী এই সংগ্রামে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। অবশেষে অনেক সাধনার ভেতর দিয়ে, অসংখ্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে বিজ্ঞান জয়লাভ করতে পেরেছে—মড়ক-

মহামারীকে চিরদিনের জন্য দুনিয়ার বুক থেকে নির্বাসিত করার পথ মানুষ আবিষ্কার করেছে।

আজ থেকে প্রায় তিনশ' বছর আগের কথা। হল্যান্ডের ছোট পরীক্ষাগারে বসে দিনের পর দিন তাঁর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের জন্য কাচ ঘষে ঘষে উন্নত ধরনের লেন্স তৈরি করছেন বিজ্ঞানী লেভনহুক। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বৃষ্টির পানিতে তিনি আবিষ্কার করলেন রোগের জীবাণু। বিজ্ঞান প্রমাণ করল, এইসব খুদে খুদে বিশেষ ধরনের জীবগুলোই রয়েছে অধিকাংশ রোগের মূলে। আগুনের তাপ দিয়ে জীবাণুকে ধ্বংস করার কায়দাও লেভনহুক বের করলেন।

এই ঐতিহাসিক আবিষ্কারের মর্যাদা লেভনহুক পেয়েছিলেন। সে সময়ের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী নিউটন এবং রসায়নবিজ্ঞানী রবার্ট বয়েলের মতো তিনি যে শুধু লন্ডনের 'রয়াল সোসাইটি'র সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাই নয়, রাশিয়ার জার পিটার দি গ্রেট এবং ইংল্যান্ডের রানী পর্যন্ত এই বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন হল্যান্ডের ছোট শহর ডেল্‌ফ্‌ট-এ।

তারপর মানবতার সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসাবিদদের এক বিরাট বিচিত্র বাহিনী জীবাণুতত্ত্বের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইতালির স্পালানজিনি, ফরাসী পাস্তুর, জার্মান কখ্ ও এরলিখ, রাশিয়ার মেচনিক্‌ফ, ইংরেজ ব্রুস, রোনাল্ড রস্ ও ব্যাটিস্টা গ্রাসি, আমেরিকান ওয়াল্টার রীড। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এসব শ্রেষ্ঠ সন্তান যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন—কোন সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, মানুষের চিরশত্রু যক্ষ্মা, জলাতঙ্ক, কলেরা, সিফিলিস, ডিপথিরিয়া, ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, ঘুম রোগ—সব রকম আধিব্যাধি মড়ক-বিভীষিকার বিরুদ্ধে। তাঁদের এই গৌরবময় সংগ্রামে অবশেষে তাঁরা জয়মাল্যও পেয়েছেন।

অবশ্যই, মৃত্যুর বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে নিরবচ্ছিন্ন সাফল্য লাভ তাঁদের ভাগ্যে ঘটে নি। পদে পদে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি তাঁদের পথকে কন্টকিত করেছে; কখনো হয়তো সাময়িকভাবে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁদের কৃতিত্ব নিষ্প্রভ হওয়া দূরে থাক বরং এই ত্যাগ ও পরাজয়ের মধ্য দিয়েই তাঁদের সংগ্রামী মহত্ত্ব আরো উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

মানুষের মৃত্যু ও রোগ যন্ত্রণার ভার লাঘব করার জন্য এই বীর সংগ্রামীদের অনেকে নিজেদের দেহে রোগ-জীবাণু ঢুকিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন; স্বেচ্ছায় তাঁদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। এসব আত্মত্যাগী বীর শহীদদের নাম ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকবে। ইতিহাস ভুলতে পারবে না ইংরেজ জন হান্টারের কথা, যিনি ১৭৭৬ সালে নিজের দেহে সিফিলিসের জীবাণু ঢুকিয়ে এই পরীক্ষায় প্রাণ দিয়েছিলেন। অ্যালান ম্যাকফ্যাডেনের কথা, যিনি ১৯০৭ সালে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন মাল্টা জ্বর নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে। বোহেমিয়ার অধ্যাপক এডমন্ড ভিলের কথা, যিনি পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন টাইফয়েড জ্বর নিয়ে। ভুলবে না ওবারমেয়ারকে, যিনি মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে প্রাণ দিয়েছিলেন কলেরা প্রতিরোধ করতে গিয়ে। ফরাসী থুইলেকে, যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন মিসরে কলেরা মহামারীতে। এবং জার্মান কখ্‌কে, যিনি এসব

আত্মত্যাগের অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষকে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন কলেরার প্রতিষেধক।

কলেরা নিয়ে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে একে একে নিজেদের শরীরে কলেরার জীবাণু প্রবেশ করিয়েছিলেন মিউনিকের অধ্যাপক পেরেনহোফার, এমেরিখ মেচনিকফ। মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত জেনেই তাঁরা অন্য কারো দেহে জীবাণু প্রয়োগ করেন নি।

প্লেগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনেকেই তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেনঃ মার্সেই-এর চিকিৎসক লুই গাঁয়ো, ভিয়েনার মূলার, পর্তুগালের গামারা পেস্তানা, সেজার জনচেসেল। আফ্রিকার অরণ্যে ঘুমরোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জীবন দিয়েছেন হ্যালাম এবং ম্যানসন। কিউবায় স্বেচ্ছায় পীতজ্বরের বাহক মশার কামড় খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন জেমস ক্যারল, ইয়ং এবং জাপানী চিকিৎসক নোগুচি। হাওয়ার্ড টেলর রিকেট্‌স এবং পোল্যান্ডের স্তানিসলাউ প্রাওয়াজেক টাইফাস রোগের জীবাণু আবিষ্কার করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। মানবতার প্রতি তাঁদের অপরিসীম দান স্মরণ করে এই জীবাণুর নামকরণ করা হয়েছে রিকেট্‌সিয়া প্রীওয়াজেকি।

এসব বীর এবং শহীদদের নামের তালিকা লিখে শেষ করা যাবে না। শিশুদের অকাল মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য, মানুষের সুখী ভবিষ্যতের জন্য এসব বিজ্ঞানী তাঁদের নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

মারী, মৃত্যু এবং ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস এমনি অসংখ্য আত্মত্যাগ এবং সাহসের কাহিনীতে উজ্জ্বল। সারা জীবন হয়তো আর্থিক বা নৈতিক সাহায্য কিছুই জোটে নি। তবু এসব বিজ্ঞানী অপরিসীম অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাঁদের গবেষণা চালিয়ে গিয়েছেন। মানব জাতির প্রতি, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ মানুষের জীবনের প্রতি গভীরতম দায়িত্ববোধ থেকেই তাঁরা এমনি আত্মত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

জীবাণু-বিজ্ঞানীদের অগ্রণী লুই পাস্তুরের সেই অমর আশা এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনির্বাণ আলোকশিখার মতো তাঁদের প্রেরণা দিয়েছেঃ

> এমন একদিন আসবে যেদিন সহজ প্রতিষেধক ব্যবস্থার সাহায্যে এসব মারী-মড়ককে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।—হ্যাঁ, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, দুনিয়ার বুক থেকে সব রকম জীবাণুবাহী ব্যাধিকে নির্মূল করা সম্ভব।

ব্যাধি এবং জীবাণুর বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম আজো চলেছে।

আমাদের চারপাশ ঘিরে সর্বত্র থই থই করছে অসংখ্য জীবাণু। কিন্তু তার সবই তো মানুষের শত্রু নয়। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালার ব্যাধি ঘটায় কয়েক জাতের জীবাণু মাত্র। তাছাড়া আরো অজস্র জাতের জীবাণু রয়েছে যেগুলো আমাদের বন্ধু। এসব উপকারী জীবাণুর সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আমাদের জীবন বাঁধা যে, এদের ছাড়া দুনিয়ায় মানুষের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ত।

তাই মানুষ জীবাণতত্ত্বের চর্চা করেছে শুধু রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুদের পরাজিত করার জন্যই নয়, উপকারী জীবাণুদের আয়ত্ত করে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্যও। কৃষিক্ষেত্রে, মদ চোলাই ও পাউরুটি সেঁকার কাজে, অ্যালকোহল, ভিনিগার, সবজির চাটনি তৈরিতে, ওষুধ এবং রাসায়নিক শিল্পে মানুষ অহরহ উপকারী

জীবাণুদের কাজে লাগাচ্ছে। জীবাণু-বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে মারাত্মক রোগ ঘটায় যে জীবাণু, তার সাহায্যেই বিজ্ঞানী-মানুষ রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করেছে।

এভাবে সব রকম ক্ষতিকর জীবাণুকেই কি মানুষের প্রয়োজন মতো পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন ধরনের জীবাণুতে পরিণত করা এবং তাকে রোগ প্রতিরোধে এবং মানব-কল্যাণের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় না?—দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের এক অংশ আজ এই পথেই তাঁদের জীবাণু গবেষণার ধারাকে পরিচালিত করছেন; শুধু তাই নয়, জীবাণুতত্ত্বকে এক সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপরেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

জীবাণুদের বেশির ভাগই এককোষী জীব ছাড়া আর কিছু নয়। বিজ্ঞানীরা আজ প্রমাণ করেছেন, জীবজগতের অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের মতোই জীবাণুদের বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃত্রিম উপায়ে তাদের রূপান্তর সাধন করা যায়। এভাবে পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলে জীবাণুর যে রূপান্তর ঘটে, তার ফলে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুকে রোগ নিরাময়কারী জীবাণুতে পরিণত করা সম্ভব হয়। আর এই আবিষ্কারের ফলে জীবাণু-বিজ্ঞানের সামনে সংক্রামক ব্যাধি ও মহামারীর আশঙ্কাকে নির্মূল করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

মানুষের কল্যাণের স্বার্থে ক্ষতিকর জীবাণুকে যাতে স্থায়ীভাবে রূপান্তরিত করা যায় এবং এভাবে জীবাণুজগতের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ব্যাধি, যন্ত্রণা, মারী, মড়ক এবং অকাল মৃত্যুকে চিরদিনের জন্য দুনিয়া থেকে নির্বাসিত করা যায়—সেই লক্ষ্যেই এসব জীবাণুবিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণাকে নিয়োজিত করেছেন।

দুনিয়ায় আরো এক ধারায় আজ জীবাণু নিয়ে গবেষণা চলেছে। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা মারী-মড়ক-ব্যাধির কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য জীবাণুর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়েছেন, আজ যার নতুন বিকাশের সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—জীবাণু-বিজ্ঞানের সে-ধারার সঙ্গে এই গবেষণার কোন মিল নেই। এই গবেষণার লক্ষ্য জীবাণুকে ধ্বংস করা নয়, মানুষের কল্যাণের কাজে ব্যবহার করাও নয়—তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য জীবাণুকে শক্তিশালী করে তুলে মানুষের ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই জাপানে, ইংল্যান্ডে, কানাডায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একদল বিজ্ঞানী সরকারী উদ্যোগে ব্যাপক ধ্বংস বিস্তার করার জন্য জীবাণুর চাষ করছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাম্প ডেট্রিকের জীবাণু-যুদ্ধ গবেষণা সম্পর্কে ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত সরকারী মার্ক (G.W. Merck) কমিটির রিপোর্টে বলা হয়ঃ "এই গবেষণায় এপর্যন্ত পাঁচ কোটি ডলার খরচ হয়েছে।... একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, জীবাণু-যুদ্ধ অত্যন্ত সুলভ হবে।" এই রিপোর্টে অনেক গোপন তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ায় এবং তীব্র জনমত সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা মাঞ্চুরিয়ার চীনা ও সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের ওপর জীবাণু-যুদ্ধের পরীক্ষা চালিয়েছে। খাবারোভ্স্ক যুদ্ধাপরাধী বিচার মামলায় (১৯৫০) এসব বীভৎস পরীক্ষার কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তখন আরো জানা যায় যে, ইশীশিরো প্রভৃতি জাপানী জীবাণু-যুদ্ধ পরিকল্পনার নেতারা মার্কিন সহযোগিতায় অক্ষত

দেহে দন্ডাজ্ঞা থেকে মুক্তি পেয়েছে। জাপানী এবং জার্মান জীবাণুবিশারদদের পরে মার্কিন যুদ্ধ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিভিন্ন মার্কিন পত্রিকাতেই স্বীকার করা হয়েছে যে, ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে যুদ্ধবন্দীদের জীবাণু যুদ্ধের পরীক্ষায় কাজে লাগানো হচ্ছে।

বোমায় পুরে জীবাণু মাখানো পোকামাকড়, পশুপাখি, খাবার, লতা-পাতা ইত্যাদি ফেলে মার্কিন সমর নেতারা কৃত্রিম উপায়ে প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড, পীতজ্বর, টাইফাস, আমাশয়, মেনিনজাইটিস প্রভৃতির ব্যাপক মড়ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন; আবার ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন মধ্যযুগের সেই মহামারীর তান্ডব আর বিভীষিকাকে।

১৯৫২ সালের ২৮ জানুয়ারি উত্তর কোরিয়ার 'ইঞ্চন' শহরের কাছাকাছি দেখা গেল মার্কিন উড়োজাহাজ উড়ে যাবার ঠিক পর পরই মাছি, পোকা এবং মাকড়সা উড়ে বেড়াচ্ছে। বছরের এ-সময়টাতে কোরিয়ার প্রচন্ড শীতে তাপমাত্রা শূন্যের বহু ডিগ্রি নিচে নেমে যায়; এ অবস্থায় এসব পোকা-মাকড় কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কতকগুলো পোকামাকড় এ অঞ্চলে একেবারেই অপরিচিত। পরীক্ষা করে দেখা গেল, এসব সন্দেহজনক পোকামাকড়ের গায়ে লাগানো আছে মারাত্মক সব রোগের জীবাণু। যে টাইফাসকে প্রতিরোধ করার জন্য রিকেট্স্ এবং প্রাওয়াজেক তাঁদের জীবন দিয়েছিলেন, তার জীবাণুও এদের মধ্যে ছিল।

তারপর উত্তর কোরিয়ার ওপর আরো অসংখ্য বার জীবাণু বোমা ফেলা হয়েছে। শুধু উত্তর কোরিয়ায় জীবাণু ছড়িয়েই তারা ক্ষান্ত হয় নি, উত্তর চীনের বিভিন্ন অংশেও বার বার জীবাণু আক্রমণ চালিয়েছে। উত্তর কোরিয়ায় গত পাঁচশ বছরের মধ্যে কোন দিন প্লেগ দেখা দেয় নি; সেখানে তারা প্লেগের বীজ ছড়িয়েছে। যে প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড, পীতজ্বরের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য অগণিত বিজ্ঞানী তাঁদের অমূল্য জীবন দান করেছেন, সেসব ব্যাধিকেই ব্যাপকভাবে বিস্তার করার এই বীভৎস প্রচেষ্টার মধ্যে ফুটে উঠেছে ইতিহাসের এক নির্মম পরিহাস।

উত্তর কোরিয়া এবং চীনাদের হাতে বন্দী উচ্চপদস্থ মার্কিন সামরিক অফিসার এবং বৈমানিকদের মধ্যে যাঁরা জীবাণু-যুদ্ধ পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় জীবাণু-যুদ্ধের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁরা প্রকাশ করেছেন, বেসামরিক জনসাধারণের ওপর ব্যাপক জীবাণু আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাস থেকেই উত্তর কোরিয়ার ওপর অল্প স্বল্প পরিমাণে জীবাণু ছড়ানো হতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তা বৃদ্ধি পায়। তাঁরা এও বলেছেন যে, উচ্চ সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নিজেদের বিবেকের বিরুদ্ধেই তাঁরা এসব মানবতা-বিরোধী ভয়াবহ জীবাণু অস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পিকিং-এ অসংখ্য প্রামাণ্য নজির সংগ্রহ করে জীবাণু-যুদ্ধ সম্পর্কে প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার দায়িত্বশীল নরনারী এই প্রদর্শনী পরীক্ষা করে জীবাণু-যুদ্ধের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। চতুর্দিক থেকে ক্রমেই অসংখ্য যুক্তি-প্রমাণ জড়ো হচ্ছে। কতখানি নৈতিক অধঃপতন ঘটলে মানুষ এমনি আত্মঘাতী বর্বরতা এবং বেসামরিক জনসাধারণের বিরুদ্ধে এই সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিকল্পনার আশ্রয় নিতে পারে, সেকথা ভেবে সারা দুনিয়ার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সৎ এবং

শান্তিকামী মানুষ আজ শিউরে উঠছেন। সমগ্র মানব সভ্যতার সামনে আজ এক মারাত্মক বিপদসংকেত দেখা দিয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে জীবাণু-যুদ্ধের গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার পর ডাক্তার থিওডোর রোজবেরি এই নৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি হন। বিবেকের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত তিনি জীবাণু গবেষণার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছেন। এই বিভীষিকার হাত থেকে মুক্তির পথ সন্ধান করতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ

> তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি শুরু হয় তাহলে জীববিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানী সব শ্রেণীর বিজ্ঞানীকে মানবতার অকল্পনীয় ধ্বংস সাধনের কাজে নিয়োজিত করা হবে। তাঁদের পক্ষে এই কাজে সহযোগিতা করা এবং একই সঙ্গে বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব কিনা, আমি জানি না। হয়তো এ প্রশ্নের কোন বিচ্ছিন্ন উত্তর নেই; এর একটাই মাত্র সামগ্রিক উত্তর হতে পারে, তা হলঃ শান্তি রক্ষিত হোক।(পীস অর পেস্টিলেন্সঃ ম্যাক্‌গ্র হিল, ১৯৪৮)।

কোরিয়া এবং চীনে জীবাণু-যুদ্ধের সত্যতা সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইতালি এবং ব্রাজিলের সেরা জীবাণু-বিজ্ঞানীদের নিয়ে যে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কমিশন গঠন করা হয়েছিল, তাঁরা বিজ্ঞানীর নিরাসক্ত মন নিয়ে দীর্ঘ দিন পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালাবার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেনঃ

> কোরিয়া এবং চীনের জনসাধারণের ওপর মার্কিন সামরিক বিভাগ জীবাণু-অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।... অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সামনে কমিশনের সদস্যরা নিতান্ত অনিচ্ছা এবং দুঃখের সঙ্গেই এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছেন; কেননা, এই অমানুষিক বর্বরতার বিরুদ্ধে দুনিয়ার সর্বজনীন জনমত সত্ত্বেও যে এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে পারে, একথা তাঁরা সহজে বিশ্বাস করতে পারেন নি।

শান্তি রক্ষিত হোক। এ কামনা আজ শুধু ডাক্তার রোজবেরি বা আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কমিশনের নয়, এ দাবী আজ দুনিয়ার মানুষ-সাধারণের। দুনিয়া জোড়া মানুষের আজ ঐকান্তিক কামনাঃ যুদ্ধবাজদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাক, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।

হাজার হাজার বছরের অক্লান্ত সাধনায় অপরিসীম ত্যাগ আর বীরত্বের বিনিময়ে মানুষের সে সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তার ধ্বংস নেই; মানুষের সেবার আদর্শে কখ্, পাস্তুর, ওয়ালটার রীডের মতো বিজ্ঞানীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত যে বিজ্ঞানের ঐতিহ্য, তারও মৃত্যু নেই।

[১৩৬০/১৯৫৩]

ব্যাধি ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে

বর্তমান জগতে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও বিজ্ঞানীদের সমবেত সহযোগিতা একত্রিত হলে বিজ্ঞানকে দিয়ে যে অসম্ভব সম্ভব করা যায়, সম্প্রতি তার চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া। পৃথক পৃথকভাবে বিজ্ঞানীরা যেসব ব্যাপারে গবেষণায় হাত দিতেই সাহস পেতেন না, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উৎসাহে ও সহায়তায় সে-সব গবেষণায় সাফল্য আজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। মানুষের জ্ঞানের জগতে এক নবযুগের বিকাশের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে পরমাণু-শক্তিকে জয় করে। পরমাণু-শক্তির মূল রহস্য উদঘাটন ছাড়াও এর মধ্যে এক যুগান্তকারী ব্যাপার হচ্ছে অতি অল্প সময়ে পরমাণু-বোমার উৎপাদন। এর উৎপাদন পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প-প্রচেষ্টার ফল; এথেকে যা কিছু শুভ পরিণতি তা সমগ্র মানব সভ্যতাই ভোগ করবে। এ সম্পর্কে বর্তমান সময়েও যেসব গবেষণা চলেছে তা থেকে মানুষের ব্যবহারিক জীবন নিঃসন্দেহে অনেকখানি সহজ হয়ে আসবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতায় নতুন নতুন জটিল সমস্যারও উদ্ভব ঘটবে।

রাশিয়ার খবরে প্রকাশ, সেখানকার বিজ্ঞানীরা নাকি সদ্যমৃত মানুষের শরীরে কিছুক্ষণের জন্য প্রাণের স্পন্দন সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন। এ সংবাদ যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে আশার কথা সন্দেহ নেই। মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানুষ চিরন্তন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে— মৃত্যুর রহস্যকে মানুষ জয় করবার সাধনা করেছে। মৃত্যুকে আজো জয় করা সম্ভব হয় নি;কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকা যায়, ততদিন পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি নিয়ে বেঁচে থাকবার বাসনা মানুষের মনে উদ্দাম। বেশিদিন বাঁচবার চেষ্টাও মানুষ করেছে, চেয়েছে অকাল-বার্ধক্যকে জয় করতে, অকাল-মৃত্যুকে রোধ করতে। রুশ বিজ্ঞানী প্রফেসর নিকোলাই সিনিট্‌সিন মানুষের পুরনো হৃদযন্ত্র বদলে তাকে নতুন জীবন দেবার সম্ভাবনা দেখিয়েছেন। মানুষের মৃত্যুকে জয় করবার অক্লান্ত সাধনা মনে হয় আজ খানিকটা সাফল্যের পথে এগিয়ে এসেছে।

সব রকমের বৈজ্ঞানিক সমস্যাকে আজকের যুগে 'পারমাণবিক' দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হচ্ছে। পরমাণু-বোমার প্রলঙ্করী দিক থেকে আজকের মানুষের দৃষ্টি ফিরেছে এর কল্যাণকর শুভ দিকে—মানুষের মঙ্গল সাধনে পরমাণু-শক্তির বিপুল ব্যবহারিক সম্ভাবনার দিকে। পরমাণু-শক্তির ব্যবহার বিজ্ঞানীদের গবেষণার দিগন্তকে অকস্মাৎ

অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিভীষিকাময় কালো আঁধারে ঢাকা যে মৃত্যু নিঃসাড়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে, মানুষের গায়ে বুলিয়ে দেয় তার শীতল কঠিন হাতখানি, আর সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় জীবনের সকল কাকলি—সেই রহস্যময় মৃত্যুকে কি পরমাণু-শক্তির সাহায্যে রোধ করা সম্ভব? শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডঃ জেমস্ ফ্রাঙ্ক (James Franck) এপ্রশ্নের একটা জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, পরমাণু-শক্তির সাহায্যে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করা যাবে কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না; কারণ এদিকে বিজ্ঞানীদের গবেষণা এখনও এক রকম শিশু অবস্থায় রয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, পরমাণু-শক্তির ধ্বংসকর মন্দ দিকের মতো এর একটা গঠনমূলক ভাল দিকও রয়েছে। পরমাণু থেকে পাওয়া এই নতুন শক্তি নিঃসন্দেহে আমাদের জৈব-রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিধি অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে। এসব গবেষণা যদি সামরিক কর্তৃপক্ষের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে অব্যাহত গতিতে প্রকাশ্যভাবে চালিয়ে যেতে দেয়া হয়, তাহলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নিশ্চিত অনেকখানি অগ্রগতি আসবে—মানুষের সভ্যতা অনেকখানি এগিয়ে যাবে।

বিজ্ঞানীদের সামনে এখন সমস্যা হচ্ছে, কি করে এই শক্তিকে ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়। তার আগে পরমাণুর-শক্তি সম্বন্ধে কিছু বলে নিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে।

প্রত্যেক পরমাণুর বস্তুমান কেন্দ্রীভূত রয়েছে একটা ক্ষুদ্র কেন্দ্রক (nucleus)-এ; এই কেন্দ্রক আবার কতকগুলো ভারি কণিকার একটি পিণ্ড। কেন্দ্রকের চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরছে কতকগুলো হালকা কণিকা—এদের নাম বিদ্যুতিণ (electron)। পরমাণুর তাহলে দুটো অংশঃ ভেতরের কেন্দ্রবস্তু, আর বাইরের বিদ্যুতিনের আবরণ। প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপায়ে এই দু'টি অংশেরই গঠন পরিবর্তিত হতে পারে। প্রথমত, বাইরের বিদ্যুতিনগুলো বদলাতে পারে — সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এধরনের স্থান পরিবর্তন ঘটে থাকে! দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রকের বস্তুকণিকাগুলোর কাঠামোরও পরিবর্তন হতে পারে। এরকম পরিবর্তন ঘটলে কিছু শক্তি উৎপন্ন হবে, আর না হয় কিছু শক্তি ব্যয় হবে।

পরিবর্তনের ফলে যদি গড়নটা আরও বেশি মজবুত হয়, তাহলে শক্তির উৎপত্তি হয়ে থাকে। যেমন ঢালু পাহাড়ের অস্থায়ী অবস্থান থেকে একটা পাথর নিচে গড়িয়ে এসে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে খানিকটা শক্তি উৎপন্ন হয়।

আগেই বলেছি, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শুধু পরমাণুর বাইরের দিকে অবস্থিত আলগা বিদ্যুতিনগুলোরই স্থান পরিবর্তন হয়। আমাদের রোজকার জীবনে বা শিল্পজগতে এধরনের পরিবর্তনগুলোই হচ্ছে আজ পর্যন্ত শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস। কতকগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়া (যেমন কয়লা পোড়ানো) থেকে আমরা প্রভূত শক্তি পেয়ে থাকি, এবং সেগুলো নানা রকম শিল্প কাজে ব্যবহার করা হয়। এতে বেশি শক্তি উৎপন্ন হবার কারণ এই যে, এই রাসায়নিক বিক্রিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোটি কোটি পরমাণুর পরিবর্তন সাধন করে। প্রকৃতপক্ষে এধরনের পরিবর্তনে একটি পরমাণু

থেকে যে শক্তি বের হয়, তা অতি নগণ্য। অসংখ্য পরমাণুর সমবেত বিক্রিয়া থেকেই আমরা কয়লার প্রয়োজনীয় তাপশক্তি পাই।

কেন্দ্রীয় (nuclear) পরিবর্তন নানা রকমের হতে পারে। এক্ষেত্রে আর আলগা বিদ্যুতিন স্থান পরিবর্তন করছে না, পরমাণুর মূল ভিত্তিপ্রস্তরগুলোই নড়ে উঠছে। কেন্দ্রকের কণিকাগুলো প্রচন্ড শক্তির বলে একসঙ্গে বাঁধা থাকে, তাই সেখানে সামান্য স্থানচ্যুতি ঘটলেই বিপুল শক্তির উদ্ভব হতে পারে। আর বাস্তবিকপক্ষে হয়েও থাকে তাই। কেন্দ্রকে পরিবর্তনের একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত হচ্ছে স্বতোদীপ্তি বা তেজস্ক্রিয়তা (radio-activity)— যখন রেডিয়ামের পরমাণু থেকে আলফা-কণিকা প্রভৃতি ছুটে বেরিয়ে আসে। পরমাণুর এরকম তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন হবার সময় যে পরিমাণ তেজের উৎপত্তি হয়, তা রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় উৎপন্ন তেজের প্রায় দশ লক্ষ গুণ বেশি। এথেকেই পরমাণুর বহিঃপরিবর্তন ও অন্তঃপরিবর্তন সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাবে।

কিন্তু এর চেয়েও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় পরিবর্তন হচ্ছে বীজ-ভঙ্গ (nuclear fission); এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণজনিত প্রচন্ড শক্তি উৎপন্ন হয়। এতে কেন্দ্রকের গড়ন আগাগোড়াই বদলে যায়—হয় একটা বিরাট রকমের পরিবর্তন। কেন্দ্রকটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায়, আর এই পরিবর্তনে শক্তি উৎপন্ন হয় তেজস্ক্রিয় পরিবর্তনের চেয়েও শতগুণে বেশি।

বীজভঙ্গের খানিকটা তেজ শক্তিশালী বিচ্ছুরণরূপে বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে কেন্দ্রকের বিচ্ছিন্ন খন্ডগুলো মোটেই স্থায়ী হয় না; তাই সেগুলোও হয় তেজস্ক্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন। এরা নানা রকমের অদৃশ্য শক্তিরশ্মি বিচ্ছুরণ করে থাকে। এই যে বিচ্ছুরণ, এগুলো শরীরের পক্ষে সাংঘাতিক রকম বিপজ্জনক। কোনও মানুষ যদি খোলা পরমাণু-শক্তি-উৎপাদক যন্ত্র থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির পাল্লার মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের জন্যও গিয়ে পড়ে, তাহলে তার মৃত্যু অবধারিত। এজন্য যন্ত্রগুলোকে সব সময় কয়েক মিটার পুরু দেয়াল দিয়ে আড়াল করে রাখা দরকার।

রশ্মিগুলো কেন যে এত ক্ষতিকর, সেটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়। শক্তিসম্পন্ন রশ্মিগুলো যখন পদার্থের মধ্যে ঢোকে, তখন পদার্থের যৌগিক গঠনের জন্য দায়ী আলগা বিদ্যুতিনগুলো সেই শক্তিকে গ্রহণ করে। তার ফলে একটা ভঙ্গুর কেন্দ্রক থেকে নিঃসৃত রশ্মির প্রভাবে আক্রান্ত পদার্থের হাজার হাজার অণুর গঠন পরিবর্তিত হয়ে যায়। জীবদেহের কোষকলার যৌগিক গঠন অত্যন্ত জটিল অথচ দুর্বল—তাই এই প্রক্রিয়া তাদের ওপর অনেক বেশি কাজ করে। একারণেই জীবন্ত দেহের ওপর পারমাণবিক রশ্মির আক্রমণ এত প্রবল।

বীজভঙ্গজনিত রশ্মি মারাত্মক হলেও তাকে মানুষের কল্যাণ-সাধনেও ব্যবহার করা যেতে পারে। হয়তো একদিন একেই নবযুগের বৈজ্ঞানিক সাধনা ও প্রগতির সব চাইতে বড় দান বলে উল্লেখ করা হবে। ছুরির ধারের যে ব্যবহার, সে শুধু প্রাণীকে বধ করবার জন্যই নয়, বাঁচাবার জন্যও। রেডিয়াম ও এক্স-রে থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিও মারাত্মক। কিন্তু ক্যানসার রোগের চিকিৎসায় তাতে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গিয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, পৃথিবীতে বছর বছর বহু লোক মারা যায় এই ক্যানসার

রোগে আক্রান্ত হয়ে। পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের উন্নততর পন্থা আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে রোগের বিরুদ্ধে পারমাণবিক রশ্মি ব্যবহার করবার সম্ভাবনা আরও বাড়বে, সন্দেহ নেই।

এতদিন পর্যন্ত এসব বিচ্ছুরণ-রশ্মির কোন প্রত্যক্ষ রোগনিরোধক ক্ষমতা আছে বলে জানা যায় নি। কিন্তু কিছুদিন আগে জাপানে পরমাণু-বোমা পড়বার পর যেসব ব্যক্তি পারমাণবিক রশ্মিতে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, তাদের অনেকের দেহের শ্বেত রক্ত-কণিকার সংখ্যা ৮ হাজার থেকে বেড়ে ৩৫ হাজার পর্যন্ত হয়েছে। এই শ্বেত রক্ত-কণিকার রোগ-জীবাণু প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা রয়েছে প্রচুর। আমাদের দেহকে স্বাভাবিক অবস্থায় এরাই ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। স্বল্প জীবনী-শক্তিসম্পন্ন রোগীর দেহে যদি এভাবে শ্বেত রক্ত-কণিকা বাড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে রোগের হাত থেকে রেহাই পাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট বাড়বে।

পরমাণু-শক্তি উৎপাদন যন্ত্র থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস পাওয়া গিয়েছে—সে হচ্ছে প্রভূত পরিমাণ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। আইসোটোপ অর্থ হচ্ছে একই মৌলিক পদার্থের সমগুণযুক্ত অথচ ভিন্ন পারমাণবিক ভরবিশিষ্ট পরমাণু। কতকগুলো আইসোটোপ আছে তেজস্ক্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন; তাদের কেন্দ্রক অস্থায়ী এবং অনবরত ভেঙ্গে ভেঙ্গে শক্তির উদ্ভব করে। প্রায় সব মৌলিক পদার্থেরই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা যায়। পরমাণু-শক্তি উৎপাদন যন্ত্রের ভেতর কোন পরমাণুকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি-প্রভাবে রেখে দিলেই সেটা সাময়িকভাবে তেজস্ক্রিয় গুণসম্পন্ন হয়। এভাবে আমাদের দেহের স্বাভাবিক মূল উপাদান যেগুলো— যেমন কারবন, আয়োডিন, ফসফরাস এসব মৌলিক পদার্থকে সাময়িকভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব। তারপর এরকম তেজস্ক্রিয় অবস্থায় তাদের দেহের পীড়ার চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়।

যেমন, আমাদের থাইরয়েড গ্রন্থি রক্তস্রোত থেকে মূলত আয়োডিনসম্পন্ন পদার্থ গ্রহণ করে। কাজেই চেষ্টা চলছে, শরীরের ভেতর তেজস্ক্রিয় আয়োডিনসম্পন্ন উপাদান প্রবেশ করিয়ে দিয়ে থাইরয়েড গ্রন্থির রোগ 'গলগন্ড' আরোগ্য করার। ঠিক এভাবেই, ক্যানসারের জন্যও একটা চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কার করা সম্ভব। বিজ্ঞানীদের প্রথম কাজ হবে এমন একটা সাধারণ উপাদান বেছে নেওয়া যা শুধু ক্যানসার-আক্রান্ত কোষকলায় শোষিত হয়। তারপরের কাজ হবে, সেই উপাদানটিকে পরমাণুর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে নতুন করে তৈরি করা; এরপর তাকে ক্যানসার রোগীর দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া। ফলাফল আশানুরূপই হবে বলে বিশ্বাস করা যায়। এধরনের গবেষণায় সাফল্য লাভ করতে হলে বহুদিন ধরে সতর্কভাবে ও ধৈর্য সহকারে পরীক্ষা চালানো দরকার। সব রোগের চিকিৎসারই যে একটা সমাধান পাওয়া যাবে তার কোনও মানে নেই, তবে পরমাণু-শক্তি থেকে আমরা ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার অনেক মোক্ষম অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারি।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপকে আর এক কাজে ব্যবহার করা হয়েছে—দেহের অভ্যন্তরে যেসব জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাদের অনুক্রম নির্ধারণ

করতে। যেমন, ধরা যাক, শর্করাজাতীয় উপাদানকে আমাদের পাকযন্ত্র কিভাবে গ্রহণ করে। আমরা জানি, শর্করা আমাদের দেহের ভেতর পোড়ে এবং তাতে রাসায়নিক পরিবর্তনজনিত তাপশক্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু দেহের স্বাভাবিক উত্তাপে এই জ্বলবার যে গতি, তা থেকে উৎপন্ন তেজে জীবন রক্ষা হতে পারে না। আবার স্বাভাবিক উপায়ে নিরাপদভাবে দেহের উত্তাপকে বাড়ানোও সম্ভব নয়। কাজেই শরীরের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোন ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে দেহের স্বাভাবিক উত্তাপেই শর্করা দহন বৃদ্ধি পেতে পারে।

দেখা গিয়েছে, একাজের জন্য শরীরের মধ্যে কতকগুলো উপাদান রয়েছে, যাদের বলা হয় এনজাইম (enzyme) বা উৎসেচক। প্রত্যেক ধরনের এনজাইম-অণুর একটা করে বিশেষ কাজ রয়েছে—ক্রমাগত তাকে সেই কাজই করে যেতে হয়। দেহের ভেতরে ২০টিরও বেশি এনজাইম নিযুক্ত রয়েছে শুধু শর্করার দহন-কাজে সহায়তা করার জন্য। কতকগুলোর কাজ হচ্ছে শর্করার অণু থেকে হাইড্রোজেন পরমাণু সরিয়ে নেয়া; আবার কতকগুলো শুধু কার্বন ডাই-অকসাইডের অণুকে ভেঙ্গে তার পরমাণুগুলো পৃথক করে দেয়। এভাবে এনজাইমদের সহায়তায় ধাপে ধাপে শর্করার দহন কাজ চলে; শর্করা ভেঙ্গে গিয়ে তা থেকে উৎপন্ন হয় তেজ—যে তেজে আমাদের দেহযন্ত্র কাজ করে।

দেহের ভেতর এভাবে শর্করার দহন-ক্রিয়া ও তার রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর কার্যক্রম নির্ধারণ করা অত্যন্ত সময় ও শ্রম-সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু এখানেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যথেষ্ট কাজে এসেছে। জৈব-রসায়নবিদরা তেজস্ক্রিয় কারবন পরমাণু দিয়ে কৃত্রিম শর্করা তৈরি করলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল, দেহের ভেতর মূল উপাদানটা ভেঙ্গে গিয়ে ভিন্ন ধরনের যৌগিক উপাদান গড়ে ওঠে। দেহের অনেক রহস্যই এতে ধরা পড়েছে। এই একই পদ্ধতিতে আর একটা পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, কি করে সূর্যকিরণের সাহায্যে গাছেরা তাদের প্রয়োজনীয় শর্করা উৎপাদন করে। এই পরীক্ষাকে বলা হয় 'ট্রেসার' (বা অনুসরক) পরীক্ষা; এতে তেজস্ক্রিয় গুণসম্পন্ন কণিকার অবস্থান যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায়। কারবনের পারমাণবিক ভর ১২। কিন্তু তার আরও চারটি আইসোটোপ রয়েছে—১০, ১১, ১৩ ও ১৪ পারমাণবিক ভরবিশিষ্ট। এদের মধ্যে ১৩ পারমাণবিক ভরের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপটিই ট্রেসার পরীক্ষার জন্য উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এধরনের পরমাণুর একটা বড় সুবিধে এই যে, একে (কারবন-১৩) কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করতে হয় না, সাধারণ কারবনের মধ্যেই শতকরা একভাগ মাত্রায় পাওয়া যায়।

তাহলে পরমাণু-শক্তি থেকে অন্তত দু'রকমের মঙ্গলের সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। প্রথম, চিকিৎসার জন্য প্রচুর পারমাণবিক রশ্মি ব্যবহার করা হবে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ও জৈব-রসায়ন গবেষণায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার হবে।

মোটের ওপর, আমাদের ভবিষ্যৎ চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরমাণু-শক্তির দানের সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। কিন্তু আগামী যুগের সে সব সোনালী সম্ভাবনার সবগুলোকে আজও বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হয় নি। আগেই বলেছি, এদিকের গবেষণা এখনও

একরকম শিশু-অবস্থাতে রয়েছে। পরমাণু-শক্তিকে মারাত্মক বোমা তৈরির হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে কোন ভাল কাজে লাগাবার পরিকল্পনা বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করতে পেরেছেন খুব অল্পদিন হল।

বিজ্ঞানীরা আশাবাদী—তাঁদের উচ্চাশার সীমা নেই। তাঁদের অধ্যবসায়, শ্রম প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে জয়মাল্য পেয়েছে — তাঁদের সাধনা ব্যর্থ হয় নি। মানুষ তার সামাজিক জীবনে সভ্যতার অগ্রযাত্রায় পদে পদে প্রকৃতি থেকে এবং আরো নানাভাবে বাধা পেয়েছে। যেখানেই তার সামনে বাধা এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানেই ডাক পড়েছে বিজ্ঞানীর। বিজ্ঞানী তাঁর সকল সামর্থ্য দিয়ে সেই বাধাকে জয় করতে চেয়েছেন—মানুষের জীবনকে সহজ করে দিতে নিজের সমস্ত সত্তাকে নিয়োজিত করেছেন। তাঁরা নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েও মানুষের জন্য সওগাত পৌঁছে দিয়েছেন; মানুষকে মানুষের মতো বাঁচবার পথ দেখিয়েছেন; মানুষকে করে তুলতে চেয়েছেন প্রকৃতির রাজ্যের অধিপতি।

কিন্তু মানুষ সব সময় বিজ্ঞানীর আত্মোৎসর্গের যোগ্য মূল্য দিতে পারে নি। মানুষেরই কল্যাণকামী বিজ্ঞানী পদে পদে মানুষের কাছে অপমানিত হয়েছেন—মানুষের হাতে উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত হয়েছেন। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাস অনেক ব্যথা-বেদনার, অনেক সাধনার ইতিহাস। পদে পদে ব্যর্থতাকে আলিঙ্গন করে বিজ্ঞানকে জয়ের পথে এগোতে হয়েছে।

আজকে বিজ্ঞানের সামনে যে প্রশ্ন সে অনেক বড় প্রশ্ন। নিকৃষ্ট ধাতু থেকে সোনা তৈরি করবার স্বপ্নে বিভোর পরশ-পাথর খ্যাপা সেই মধ্যযুগীয় আলকেমির রাজত্ব আজ শেষ হয়েছে। বিজ্ঞানীর সামনে নিত্য নতুন সমস্যা জটিল আকারে দেখা দিচ্ছে। বিজ্ঞানীর সামনে আজ বিরাট প্রশ্ন জাগছে—বিজ্ঞান কি একদিন মৃত্যুকেও জয় করতে পারবে?

[১৩৫৩/১৯৪৬]

পরমাণু-শক্তির তেজস্ক্রিয় প্রভাব

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সমগ্র মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন বলে গণ্য হবে। এই দিনই আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পৃথিবীর মানুষ জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপর প্রথম পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণের কথা জানতে পায়। একটি বোমার আঘাতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায় সমৃদ্ধ হিরোশিমা শহর। এর তিনদিন পর নাগাসাকি শহরের ওপর পড়ে দ্বিতীয় পরমাণু-বোমা। দুটো বোমাই ছিল প্রায় সমান শক্তিশালী; কিন্তু হিরোশিমা হল সমতলভূমি, আর নাগাসাকি উঁচু খাড়াই-উৎরাই-এ ভরা। তাই হিরোশিমায় যেখানে হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হল প্রায় ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার লোক আর ধ্বংস হল ১২ বর্গকিলোমিটার এলাকা, সেখানে নাগাসাকিতে হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হল প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার, ধ্বংস হল ৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা।

এমন প্রচন্ড বিস্ফোরণ-ক্ষমতার কথা মানুষ এর আগে আর কখনো শোনে নি। এপর্যন্ত মানুষ জানত রাসায়নিক বিস্ফোরকের কথা—সবচেয়ে শক্তিশালী যে রাসায়নিক বিস্ফোরকের কথা জানা ছিল তার নাম টি.এন.টি.। হিসেব করে দেখা গেল হিরোশিমা-নাগাসাকির পরমাণু-বোমার প্রত্যেকটিতে মাত্র ৫০ কেজি ওজনের ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম বিস্ফোরক ব্যবহার করে পাওয়া গিয়েছে ২০ হাজার টন টি.এন.টি-র সমান শক্তি।

এই ভয়াবহ ধ্বংসকান্ডের পর ন'বছর যেতে না যেতেই তৈরি হল হাইড্রোজেন বোমা। ১৯৫৪ সালের ১ মার্চ তারিখে প্রশান্ত মহাসাগরের বিকিনি প্রবালদ্বীপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হল। দেখা গেল, এবার আর ২০ হাজার টন নয়, এই বিস্ফোরণের শক্তি প্রায় দেড় কোটি টন টি.এন.টি-এর সমান। অর্থাৎ সোজা কথায়, এটা হিরোশিমা-নাগাসাকির বোমার চেয়ে প্রায় হাজারগুণ বেশি শক্তিশালী। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বললেন, সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসে এপর্যন্ত যত বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার হয়েছে তার সবগুলোর শক্তি একসঙ্গে যোগ করলেও এই একটি হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে না।

কিন্তু দুনিয়ার মানুষের কাছে শুধু এই ভয়াবহ বিস্ফোরণ-শক্তি আর ধ্বংসের তথ্য পরিবেশন করেই বিজ্ঞানীরা ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা বললেন, এই বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি জীবদেহে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তার কাছে সরাসরি বিস্ফোরণের অতি প্রচন্ড ধ্বংসক্ষমতাও হয়তো একদিন নগণ্য বলে বিবেচিত হবে।

এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রচারিত হবার পর থেকেই পরমাণু-শক্তির তেজস্ক্রিয়া নিয়ে সারা দুনিয়ায় আলোচনার ঝড় বয়ে চলেছে। জনসাধারণ এই ভয়াবহ বিপদ সম্বন্ধে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছেন—বিজ্ঞানীরাও এই বিপদের সঠিক প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে বিকিনি দ্বীপে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের সময় আকস্মিক একটি দুর্ঘটনা না ঘটলে হয়তো আজো এই বিপদ সম্বন্ধে তেমন কোন আভাসই পাওয়া যেত না। এই পরীক্ষাকালে প্রশান্ত মহাসগরের প্রায় সোয়া লক্ষ বর্গকিলোমিটার জুড়ে এক বিশাল এলাকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতির নিষ্করুণ বিশ্বাসঘাতকতায় তাতেও পরীক্ষার ভয়াবহতা গোপন রাখা যায় নি। মার্কিন পরমাণু-শক্তি কমিশনের বিশিষ্ট সদস্য টমাস মারে স্বীকার করেছেনঃ

> পূর্বাহ্নে স্থির করা হয়েছিল, এই বিস্ফোরণ সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত ঘোষণা প্রকাশ করা হবে না। কিন্তু বিধির অলৌকিক বিধানে এই বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয় ভস্ম হাওয়ায় ভর করে বিকিনি দ্বীপ থেকে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার দূরে 'ফুকুরিয়ু মারু' (ভাগ্যবান ড্রাগন) নামে এক জেলে-জাহাজের ওপর গিয়ে পড়ে। 'ভাগ্যবান ড্রাগনের' ২৩ জন জেলের ওপর তেজস্ক্রিয় ছাই পড়ার ফলে মানবজাতির সামনে যে ভয়ঙ্কর বিপদ ওত পেতে আছে তার খবর সতর্ক গোপনীয়তার দুর্ভেদ্য বর্ম ভেদ করে প্রকাশ্য আলোতে বেরিয়ে এল। আর এই খবর বেরিয়ে পড়ায় সারা দুনিয়ায় যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হল তার প্রচণ্ডতা বুঝি খোদ হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। (নিউইয়র্ক টাইমস্, ১৮ নভেম্বর ১৯৫৫)।

এই আলোড়নে অংশ নিয়ে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা পরমাণু-অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। দেশে দেশে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার বিপদ সম্পর্কে গণ-আন্দোলন গড়ে উঠেছে। খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও জনসাধারণ কম আতঙ্কগ্রস্ত হয় নি। রাশিয়া রাজি হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাইড্রোজেন বোমা ও অন্যান্য পরমাণু-অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করা উচিত কিনা সে-সম্পর্কে ১৯৫৬ সালে একটি 'গ্যালপ পোল' (গণভোট) অনুষ্ঠিত হয়। তাতে দেখা গেল মাত্র শতকরা ২৪ জন মার্কিন নাগরিক পরমাণু-অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার পক্ষে। ১৯৫৭ সালে আবার এবিষয়ে গণভোট গ্রহণ করা হয়; এবার শতকরা ৬৩ জনই পরীক্ষা বন্ধ করার পক্ষে মত দেন।

মার্কিন দেশের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী ডঃ লাইনাস পলিং বলেছেন, এপর্যন্ত যেসব পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে তার তেজস্ক্রিয় প্রভাবের ফলে ইতোমধ্যেই দশ হাজার লোক দুরারোগ্য লিউকেমিয়া রোগে মারা গিয়েছে বা মারা যাবে; তাছাড়া প্রায় দশ লক্ষ গুরুতর রকম বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হবে এবং প্রায় বিশ লক্ষ শিশু জন্মের আগে বা অব্যবহিত পরে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। উল্লেখ্য যে, হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা বন্ধের দাবী জানিয়ে ডঃ লাইনাস পলিং-এর আবেদনে আরো দু'হাজার বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানী স্বাক্ষর করেছেন।

ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে রক্‌ফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থ সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেজ' ১৯৫৫-৫৬ সালে এই তেজস্ক্রিয়ার প্রভাব সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। এই দীর্ঘ এবং বিস্তারিত রিপোর্টের মূল

কথা হলঃ ১. এক নতুন, রহস্যময় এবং বিপজ্জনক শক্তি পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে, ২. এর সম্পর্কে অনেক তথ্যই এখনো অজ্ঞাত; ৩. ভবিষ্যতে ভয়াবহ বিপদ ঠেকাতে হলে এখনই প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এরপর বিভিন্ন দেশে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত আরো বহু আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ কমিটি তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল রিপোর্টের আকারে পেশ করেছেন। ১৯৫৬ সালে ব্রিটিশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল এবং ভারত সরকার তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় জাপান বিজ্ঞান সমিতি, বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থা এবং মার্কিন জাতীয় কংগ্রেসের তেজস্ক্রিয়ার প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কমিটির রিপোর্ট। পৃথিবীর পঁচিশটি দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত কমিটি আড়াই বছর ধরে ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর এই রিপোর্টটি প্রণয়ন করেছেন।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, সবগুলো বিশেষজ্ঞ কমিটির মূল সিদ্ধান্তের মধ্যে আশ্চর্যরকম মিল রয়েছে। যেমন, প্রত্যেকটিই এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে উদ্ভূত তেজস্ক্রিয়া আজকের দিনের এবং আগামী দিনের মানুষের জন্য এক ভয়াবহ বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। তেজস্ক্রিয়া, তা সে যত সামান্য পরিমাণেই হোক, মানুষের ক্ষতি সাধন করতে পারে, এবং তেজস্ক্রিয়ার পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতির সম্ভাবনা আনুপাতিক হারে বেড়ে চলে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে এপর্যন্ত কি পরিমাণ জীবতাত্ত্বিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে সে সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত করা না গেলেও বংশধরদের মধ্যে যে এর গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে সে বিষয়ে প্রায় সব বিশেষজ্ঞই একমত। পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ছাড়াও পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদন-কেন্দ্রের বিকিরণ, চিকিৎসা ও শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্ত রঞ্জনরশ্মি বা অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত বিকিরণ থেকেও যে বিপদ দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কেও সব বিশেষজ্ঞ কমিটিই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ক্ষতি হয় প্রধানত চার রকমভাবে। প্রথমত, হাওয়ার প্রলয়ঙ্কর আলোড়ন, যাতে চারপাশে প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত সব কিছু ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়; আড়াই কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়িঘরের গুরুতর রকম ক্ষতি হয়। দ্বিতীয়ত প্রচণ্ড তাপের হল্কা—যাতে বহুদূর পর্যন্ত সবকিছু দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে; এই তাপে দেড় কিলোমিটার দূরে যেসব লোক দাঁড়িয়ে থাকবে তাদেরও শতকরা পঞ্চাশজন সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বে। এরপর আসে বিস্ফোরণ থেকে উৎপন্ন স্বল্পস্থায়ী কিন্তু মারাত্মক গামারশ্মি এবং নিউট্রন কণার বর্ষণ। শক্তিশালী নিউট্রন রশ্মির প্রভাবে আশেপাশের সব জিনিস তেজস্ক্রিয়তা লাভ করে এবং নিজেরা মারাত্মক রশ্মি বিকিরণ করতে শুরু করে। এর ফলে সৃষ্টি হয় বিস্ফোরণের চতুর্থ প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে উৎপন্ন দীর্ঘস্থায়ী গামারশ্মি এবং বিটারশ্মি।

এসব তেজস্ক্রিয় রশ্মি যে কি রকম মারাত্মক তার শুধু একটা দৃষ্টান্ত দিলেই এখানে যথেষ্ট হবে। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে যেসব গর্ভবতী নারী তেজস্ক্রিয়ার প্রভাবের মধ্যে পড়েছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ে নি, পরে দেখা গেল তাদের শতকরা ২৫ জনের গর্ভপাত ঘটেছে; শতকরা আর ২৫ জন সন্তান লাভ করলেও এক বছরের মধ্যে সে-সব

শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সে অঞ্চলের স্বাভাবিক শিশুমৃত্যুর তুলনায় এই হার আটগুণ বেশি। যেসব ছেলেমেয়ে বেঁচে গিয়ে চার-পাঁচ বছরের বড় হল, দেখা গেল তাদের চার ভাগের এক ভাগ হল ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক (microcephalous) এবং মানসিক বিকৃতিসম্পন্ন।

হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের ফলাফলও মোটামুটি একই ধরনের। তবে আগেই বলা হয়েছে, এর শক্তি পরমাণু-বোমার চেয়ে প্রায় হাজার গুণ বেশি। সাধারণ আকারের (২০ মেগাটন বা ২ কোটি টন টি.এন.টি-র সমান) একটি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে চারপাশে দু'শ বর্গকিলোমিটার এলাকার সব বাড়িঘর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হবে; ৫০০ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়িঘরের গুরুতর রকম ক্ষতি হবে, আর আংশিক ক্ষতি হবে প্রায় ২,৫০০ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত। পরিষ্কার মেঘমুক্ত দিন হলে তাপের প্রভাবে ত্রিশ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত মানুষের গায়ের চামড়া ঝল্‌সে যেতে পারে।

কিন্তু বিস্ফোরণের এই ঝাপটা বা তাপের চেয়েও গুরুতর ক্ষতি হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মির ফলে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন স্বল্পস্থায়ী মারণরশ্মির প্রভাবে তিন কিলোমিটার দূরে যেসব লোক থাকবে তাদের অর্ধেক সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বে। তার ওপর রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী তেজস্ক্রিয় ভস্ম। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, মাটির কাছাকাছি বিস্ফোরণ ঘটলে এক কোটি থেকে দশ কোটি টন ওজনের মাটি-পাথর বাষ্পাকার তেজস্ক্রিয় ধূলিকণায় পরিণত হয়ে আকাশে দশ-পনের কিলোমিটার উঁচু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে বিকিনি দ্বীপে প্রথম হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষায় তেজস্ক্রিয় মারণরশ্মি ২৫,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। উঁচু বায়ুমন্ডলে যেসব সূক্ষ্ম তেজস্ক্রিয় ধূলিকণা ছড়িয়ে পড়ে সেগুলো হাওয়ায় ভর করে ধীরে ধীরে দশ বছর ধরে সারা পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এতো সবারই জানা যে, প্রকৃতির সব জিনিসেরই মূল উপাদান হল ৯২টি স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থ। বিজ্ঞানীরা এদের পারমাণবিক ভর এবং কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক প্রকৃতি অনুসারে ১ থেকে ৯২ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। যেমন, সবচেয়ে হাল্‌কা গ্যাস হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হল ১, আবার ভারি ধাতু ইউরেনিয়ামের পরমাণুসংখ্যা ৯২। এই পরমাণুসংখ্যা ছাড়াও প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর একটা করে নির্দিষ্ট ভর আছে। যেমন, হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর ১, অকসিজেনের ১৬, লোহার ৫৬, ইউরেনিয়ামের ২৩৮ ইত্যাদি। সাধারণ পরমাণু বললাম এজন্য যে, দেখা গিয়েছে, এসব পরমাণুর সঙ্গে মিশে থাকে অতি সামান্য মাত্রায় অসাধারণ পরমাণু, অর্থাৎ ২ ভরের হাইড্রোজেন, ১৭ ও ১৮ ভরের অকসিজেন, ২৩৪ ও ২৩৫ ভরের ইউরেনিয়াম, ইত্যাদি। একই পরমাণুসংখ্যা এবং রাসায়নিক গুণাগুণ অথচ কিছুটা ভিন্ন ভরের এসব অসাধারণ পরমাণুর নাম দেওয়া হয়েছে সাধারণ পরমাণুর 'আইসোটোপ' বা সমস্থানিক।

বিজ্ঞানীরা আরো দেখেছেন, কতকগুলো ভারি মৌলিক পদার্থ আছে (যেমন রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি) যেগুলো আপনাআপনি তেজ বিকিরণ করতে থাকে।

এসব অদৃশ্য শক্তিশালী রশ্মি বিকিরণ করার ফলে এদের বস্তু ক্ষয় হয় এবং ক্রমে ক্রমে এরা অন্য অপেক্ষাকৃত হালকা মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে বস্তুর স্ফুরণশীলতা বা তেজস্ক্রিয়া (radioactivity)। রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি গুটিকতক মৌলিক পদার্থ স্বভাবতই তেজস্ক্রিয়। কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে আশেপাশের প্রায় যে কোন জিনিসই রূপান্তরিত হয়ে তেজস্ক্রিয়তা লাভ করতে পারে; তখন এরা পরিণত হয় তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক বা রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপে। যেমন, কারবন বা অঙ্গারের পরমাণুর স্বাভাবিক ভর হল ১২। কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণে বাতাসে ১৪ ভরের যে তেজস্ক্রিয় কারবনের সৃষ্টি হয় তা মানুষের শরীরে ঢুকে গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য বলতে হবে যে, বিস্ফোরণের ভস্মের সঙ্গে যেসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে তার বেশির ভাগেরই তেজস্ক্রিয়া স্বল্পস্থায়ী। কিন্তু ধরা যাক তেজস্ক্রিয় কারবন ১৪-র কথা। জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কমিটির মতে, এপর্যন্ত যেসব পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে তাতে পৃথিবীর কাছাকাছি বায়ুমন্ডলে সাধারণ কারবনের মধ্যে তেজস্ক্রিয় কারবনের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে; এবং যেহেতু কারবন হল সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদ-দেহের অন্যতম প্রধান উপাদান, কাজেই স্বভাবতই এর ফলে সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহেও তেজস্ক্রিয় কারবনের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বের করেছেন, তেজস্ক্রিয় কারবন ১৪-র তেজ অর্ধেক কমে আসতে ৫,৬০০ বছর সময় লাগে। অর্থাৎ আজকের এই তেজস্ক্রিয়তা সামান্য হলেও আমাদের বংশধরদের মধ্যে এর প্রভাব অন্তত আট হাজার বছর চলতে থাকবে।

বিস্ফোরণের ফলে আর যেসব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে পড়ে স্ট্রন্‌শিয়াম ৯০, সিজিয়াম ১৩৭ এবং আয়োডিন ১৩১। স্ট্রন্‌শিয়াম হল ক্যালসিয়ামের মতো একটা ধাতু; অনেকটা একই ধরনের এদের রাসায়নিক প্রকৃতি। সাধারণ নিরীহ স্ট্রন্‌শিয়ামের পারমাণবিক ভর ৮৮, কিন্তু এর সমস্থানিক স্ট্রন্‌শিয়াম ৯০ মারাত্মক তেজস্ক্রিয়াসম্পন্ন। তেজস্ক্রিয় ধূলিকণা যখন মাঠে ছড়িয়ে পড়ে তখন শস্য, তরিতরকারি বা ফলমূলের মাধ্যমে সেটা ঢোকে মানুষের শরীরে। মাঠে গরু ঘাস খায়, গরুর দুধের সঙ্গে স্ট্রন্‌শিয়াম ঢোকে শিশুর দেহে। ক্যালসিয়ামের মতো স্ট্রন্‌শিয়ামও বিশেষ করে সঞ্চিত হয় শিশুর বর্ধিষ্ণু হাড়ে। সেখানে এর তেজস্ক্রিয়া হাড়ের মজ্জাকে নষ্ট করে দেয়, হাড়ের ক্যানসার এবং লিউকেমিয়া রোগ সৃষ্টি করে। এর তেজস্ক্রিয়া ২৮ বছরে অর্ধেক কমে, কাজেই একবার শরীরে ঢুকলে সারা জীবনই এর তেজস্ক্রিয়ার প্রভাব বয়ে বেড়াতে হবে। সিজিয়াম ১৩৭ ছড়িয়ে পড়ে মানুষের সারা শরীরে, এর অর্ধআয়ুষ্কাল ৩৩ বছর। আয়োডিন ১৩১ বিশেষভাবে সঞ্চিত হয় থাইরয়েড গ্রন্থিতে; এর অর্ধেক শক্তি নিঃশেষ হয় ৮ দিনে।

নানা রকম পারমাণবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এপর্যন্ত এক হাজারেরও ওপরে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের খোঁজ পেয়েছেন। কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংখ্যা এত বেশি হলেও তারা যেসব রশ্মি বর্ষণ করে তার সংখ্যা মাত্র তিনটি। এদের নাম দেওয়া

হয়েছে আল্‌ফা-রশ্মি, বিটারশ্মি এবং গামারশ্মি। আল্‌ফা-রশ্মির চলার দৌড় সামান্য—অল্প বাধাতেই এরা প্রতিহত হয়; কাজেই বাইরে থেকে এদের পক্ষে দেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করবার সম্ভাবনা খুব কম।

বিটারশ্মি বিকীর্ণ হয় কারবন ১৪, স্টন্‌শিয়াম ৯০, সিজিয়াম ১৩৭ এবং আয়োডিন ১৩১ থেকে। এরও চলার দৌড় কম—কয়েক সেন্টিমিটার থেকে কয়েক মিটার পর্যন্ত। শরীরের ওপরে কোন জায়গায় বিটারশ্মি কেন্দ্রীভূত হলে সেখানে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক দুরারোগ্য ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তবে এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিঃশ্বাস বা খাদ্যের সঙ্গে দেহের ভেতর প্রবেশ করলে অনেক বেশি মারাত্মক এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

সবচেয়ে শক্তিশালী এবং মারাত্মক হল গামারশ্মি। সিজিয়াম ১৩৭ এবং আয়োডিন ১৩১ এই রশ্মি বিকিরণ করে। গামারশ্মি প্রকৃতির দিক থেকে এক্সরে-র সগোত্র, কিন্তু এর ভেদক্ষমতা এক্সরে-র চাইতে বহুগুণে বেশি; ত্রিশ সেন্টিমিটার পুরু লোহার পাত দিয়ে আড়াল করেও গামারশ্মিকে পুরোপুরি ঠেকানো যায় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানে পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণে যে হাজার হাজার লোক মারা গিয়েছিল তার বেশির ভাগেরই মৃত্যু ঘটেছিল এই গামারশ্মির প্রভাবে।

মানুষের শরীরে গামারশ্মির বাহ্যিক দেহগত প্রভাব হল, এক সেকেন্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে এই রশ্মি দেহের সমস্ত রক্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে (অস্থি-মজ্জা, প্লীহা ইত্যাদি) বিকল করে দেয়। কয়েক ঘন্টার মধ্যে দেহের সব শ্বেতরক্তকণিকা উধাও হয়ে যায় এবং ফলে সামান্যতম রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতাও লোপ পায়। রোগীর অনবরত বমি হতে থাকে, মাথার চুল ঝরে পড়ে, অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ শুরু হয়, গায়ের চামড়া ফুলে ওঠে এবং গলে গলে পড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে না হলেও কিছুদিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু গামারশ্মির এই দেহগত প্রতিক্রিয়াই সব নয়; এর চেয়েও মারাত্মক হল এর প্রজননগত (genetic) প্রতিক্রিয়া। কেননা এই প্রতিক্রিয়া শুধু বর্তমান কালের মানুষেরই ক্ষতি সাধন করে না, আগামী যুগের কোটি কোটি বংশধরের ভবিষ্যতকেও অন্ধকারময় করে তোলে।

বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, সব প্রাণীদেহই অসংখ্য আণুবীক্ষণিক জীবকোষের সমাবেশে তৈরি । প্রতিটি জীবকোষেই বীজপঙ্কের মধ্যে ডুবে আছে একটি করে বীজকেন্দ্র। মানুষের শরীরের প্রত্যেকটি বীজকেন্দ্রে আবার আছে ৪৬টি করে ক্রোমোজোম-তন্তু। জন্মের সেই আদি মুহূর্তে পুং-জননকোষের ২৩টি ক্রোমোজোম এবং স্ত্রী-জননকোষের ২৩টি ক্রোমোজোম মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে ৪৬টি ক্রোমোজোমবিশিষ্ট প্রথম নিষিক্ত কোষ। এই আদি নিষিক্ত কোষটি ক্রমে ক্রমে বিভক্ত হয়ে যেমন পরবর্তী কালের কোটি কোটি দেহকোষের উৎপত্তি হয়, তেমনি এই প্রথম ৪৬টি ক্রোমোজোম বংশানুক্রমে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি কোষেই অনুরূপ ৪৬টি ক্রোমোজোমের সৃষ্টি করে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, সেই প্রথম নিষিক্ত জননকোষটি কি করে বুঝতে পারে যে, তাকে ক্রমে ক্রমে একটি মানবশিশু হয়ে গড়ে উঠতে হবে; অর্থাৎ একটি ছাগলছানা বা

পেয়ারা গাছ না হয়ে তাকে হতে হবে একটি ভীমকান্তি ব্যায়ামবিদ শামসুল আলম, ক্ষীণদেহ সুকণ্ঠ গায়ক সুব্রত রায় অথবা অসাধারণ মেধাশালী নওশাবা সুলতানা। অর্থাৎ আরো সোজা কথায়, একজন মানুষের নির্দিষ্ট দেহলক্ষণ বা প্রকৃতি সেই প্রথম কোষটির মধ্যে কি করে নির্ধারিত হয়?

জীব-বিজ্ঞানীরা এপ্রশ্নের একটি জবাব দিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, মানুষের দেহকোষে যে ৪৬টি করে ক্রোমোজোম-তন্তু রয়েছে তার প্রত্যেকটিতে আবার আছে প্রায় হাজার খানেক বিন্দুবৎ জিন-কণিকা; এরাই হল তার দেহলক্ষণের নিয়ামক। মানুষের প্রত্যেক কোষে এমনি অন্তত ৫০,০০০ জিন-কণিকা রয়েছে; নাকের গড়ন, গায়ের রং, চুলের ঢেউ, বদমেজাজী বা শিল্পীসুলভ স্বভাব—এসব প্রতিটি দেহলক্ষণ বা প্রকৃতির জন্যই এক বা একাধিক জিন-কণিকা দায়ী। এবং যেহেতু প্রত্যেক কোষের ৪৬টি ক্রোমোজোমের মধ্যে অর্ধেক পিতার এবং অর্ধেক মাতার দেহ থেকে পাওয়া, কাজেই উভয়ের জিন-বৈশিষ্ট্য মিলিতভাবে সন্তানের বংশগতি (heredity)-কে প্রভাবান্বিত করে।

এসব জিন সাধারণত বংশপরম্পরায় নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলে। কিন্তু ১৯২৭ সালে ম্যুলার (H. J. Muller) আবিষ্কার করলেন, এক্স-রে প্রভৃতি রশ্মি বিকিরণের সাহায্যে জিনে বিকৃতি ঘটানো সম্ভব—অর্থাৎ তার ফলে দেহলক্ষণের পরিবর্তন ঘটবে। জিনের এমনি পরিবর্তনকে বলা হয় পরিব্যক্তি (mutation), আর এর পরিমাণ নির্ভর করে বিকীর্ণ রশ্মির তীব্রতা এবং পরিমাণের ওপর। দেখা গেল, এসব পরিবর্তন প্রায় সবক্ষেত্রেই হয় ক্ষতিকর, বহু লক্ষ পরিবর্তনের মধ্যে হয়তো একটি আকস্মিক কল্যাণকর হতে পারে।

আমরা বুঝতে না পারলেও আমাদের চারপাশে সব সময়ই কিছু না কিছু তেজস্ক্রিয়তা রয়েছে। মাটিতে পাথরে খুব সামান্য পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে, বাইরের মহাকাশ থেকে বায়ুমন্ডলে অনবরত কস্‌মিক রশ্মির বর্ষণ হয়, মানুষের শরীরের মধ্যে সূক্ষ্ম পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম, কারবন এবং রেডিয়াম আছে। এসবের সম্মিলিত প্রভাবকে বলা যেতে পারে 'স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক তেজস্ক্রিয়া'। এই পারিপার্শ্বিক তেজস্ক্রিয়া থাকার ফলে মানুষের দেহে সব সময়ই কিছু কিছু জিনের পরিব্যক্তি ঘটছে। অবশ্য বহু লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে মানুষ এই পরিব্যক্তির সঙ্গে নিজেকে অনেকখানি খাপ খাইয়ে নিয়েছে—অর্থাৎ যে হারে তার দেহে জিনের পরিব্যক্তি ঘটছে অনেকটা সেহারেই সে আবার তার দেহ থেকে বিকৃত জিন বর্জন করে চলেছে।

জিনের পরিব্যক্তির ফলে মানুষের দেহে যেসব ক্ষতি হতে পারে তার মধ্যে পুং বা স্ত্রী-জননকোষের ওপর তেজস্ক্রিয়ার প্রভাবই সব চাইতে ক্ষতিকর। কখনো কখনো মাতা বা পিতার জননকোষে একটিমাত্র বিকৃত জিনের ফলেও মৃত বা গুরুতর পঙ্গু শিশুর জন্ম হতে পারে। পরিব্যক্ত জিনের প্রভাবে সন্তানের নানা ধরনের দৈহিক ও মানসিক বিকৃতি দেখা দিতে পারে। অবশ্য এসব বিকৃতি সাধারণত সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকৃত জিনের প্রভাব প্রথম প্রজন্মে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, কিংবা প্রকাশ পেলেও অতি সামান্য আকারে প্রকাশ পায়। কিন্তু ২,৫ বা ১০ প্রজন্ম পর এর প্রতিক্রিয়া চরম নৃশংস রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

তেজস্ক্রিয়ার প্রভাব নিরূপণ করার জন্য বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রিয় রশ্মির একটি একক নির্ধারণ করেছেন; রঞ্জনরশ্মির আবিষ্কারকের নাম অনুসারে এই এককের নাম রাখা

হয়েছে 'রন্ট্‌গেন' বা সংক্ষেপে ইংরেজি অক্ষর r (আর)। ১ গ্রাম (এক কেজির হাজার ভাগের ১ভাগ) পরিমাণ রেডিয়াম থেকে এক মিটার দূরে প্রতি ঘন্টায় যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মি পৌঁছায় তারই নাম হল ১ রন্ট্‌গেন। এই হিসেব মতো বুকের সাধারণ এক্স-রে ছবি নেবার সময় বুকে প্রায় ১/৩ রন্ট্‌গেন পরিমাণ তেজস্ক্রিয় প্রভাব পড়ে। জন্মের পর থেকে ৩০-৪০ বছর বয়সের মধ্যে একজন মানুষের শরীরে পারিপার্শ্বিক বাতাস, পানি, মাটি থেকে প্রায় ৪ রন্ট্‌গেন তেজস্ক্রিয়া প্রবেশ করে। (র‍্যাড, রেম প্রভৃতিও অনেকটা একই ধরনের একক— কিন্তু তুলনামুলক আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা এখানে শুধু রন্ট্‌গেনের এককই ব্যবহার করব।)

কতখানি তেজস্ক্রিয়া মানুষের শরীরে গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে? নাগাসাকির অভিজ্ঞতা থেকে এবং গবেষণাগারের অন্যান্য পরীক্ষা থেকে হিসেব করা হয়েছে, ৪০০ রট্‌গেন রশ্মি যাদের ওপর পড়বে তাদের শতকরা ৫০ জনই মারা পড়বে (Lethal Dose 50), আর এর দ্বিগুণ রশ্মি যাদের ওপর পড়বে তাদের মধ্যে মারা পড়বে প্রায় সকলেই (শতকরা ৯৫-এর বেশি)। এই মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে না ঘটলেও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ঘটবে।

এধরনের দেহগত প্রতিক্রিয়ার চেয়ে বহুগুণে কম রশ্মিতেই প্রজননগত প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। বিখ্যাত ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী জে. বি. এস. হ্যালডেনের মতে মানুষের শরীরে স্বাভাবিকভাবে যে পরিব্যক্তি ঘটে তার প্রায় সবটারই মূলে রয়েছে পারিপার্শ্বিক তেজস্ক্রিয়া। একটু আগেই বলা হয়েছে, ৩০-৪০ বছর বয়সের মধ্যে একজন মানুষের শরীরে পারিপার্শ্বিক তেজস্ক্রিয়া থেকে প্রায় ৪ রন্ট্‌গেন রশ্মি এসে পড়ে। এর মধ্যে অবশ্য জননকেন্দ্র (gonads) পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ৩ রন্ট্‌গেন রশ্মি, আর সেটাই হল প্রজননগত প্রভাবের জন্য দায়ী। অর্থাৎ কোন কারণে বাইরে থেকে যদি আর ৩ রন্ট্‌গেন রশ্মি জননকেন্দ্রের ওপর পড়ে তাহলে মোট রশ্মির পরিমাণ এবং সঙ্গে সঙ্গে জিন-বিকৃতির হার বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এর ফল মারাত্মক হতে পারে। ম্যুলারের মতে, জিন-পরিব্যক্তির হার দ্বিগুণ হলে সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বই হয়তো বিপন্ন হয়ে পড়বে।

আর এক হিসেব মতো জিন-পরিব্যক্তি দ্বিগুণ হবার জন্য মাথাপিছু অন্তত ৩০ রন্ট্‌গেন রশ্মির প্রয়োজন। এবং তার ফলে বর্তমানে যেখানে স্বাভাবিক কারণে শতকরা ২ জন বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে সেখানে শতকরা ৪জন গুরুতর রকম বিকৃত শিশুর জন্ম হবে। প্রথম প্রজন্মে এই সব বিকৃতির শতকরা এক ভাগ প্রকাশ পাবে।

মার্কিন পরমাণু-শক্তি কমিশন তাঁদের গবেষণাগারের কর্মীদের জন্য তেজস্ক্রিয়ার বিপদসীমা নির্ধারণ করেছিলেন সপ্তাহে ১/৩ রন্ট্‌গেন বা বছরে প্রায় ১৬ রন্টগেন। কিন্তু প্রজননগত বিপদ সম্পর্কে নতুন তথ্য উদঘাটিত হওয়ায় ১৯৫৭ সাল থেকে তাঁরা নতুন বিপদসীমা স্থির করেছেন সপ্তাহে ১/১০ রন্ট্‌গেনের কম, অর্থাৎ বছরে ৫ রন্ট্‌গেন। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই বিপদসীমা শুধু গবেষণাগারের নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মীর জন্যই প্রযোজ্য। বিজ্ঞানীদের মতে, বড় জনবসতির ক্ষেত্রে বিপদসীমা হবে এর দশ ভাগের এক ভাগ এবং বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার জন্য এর একশ' ভাগের এক ভাগ।

এবার স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেবে, এপর্যন্ত পৃথিবীতে যেসব পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে তাতে কি বায়ুমন্ডলে তেজস্ক্রিয়ার পরিমাণ বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছেছে? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়। এযাবৎ পৃথিবীতে যে ক'টি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে তার ফলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয়া হয়তো এখনই তেমন গুরুতর বিপদের

পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং অন্যান্য প্রায় সব বিজ্ঞানীই একমত যে, তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিপদের প্রায় কোন নিম্নসীমা নেই। অতি সামান্য পরিমাণ রশ্মি থেকেও কিছু –না –কিছু বিপদ ঘটতে পারে এবং সামান্য রশ্মি দীর্ঘদিন ধরে প্রযুক্ত হলে তার সমষ্টিগত ফল গুরুতর হবে।

তাছাড়া পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, তেজস্ক্রিয় ভস্ম সমগ্র পৃথিবীতে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ছে না। এপর্যন্ত যেসব পরীক্ষা হয়েছে তার ভস্ম প্রধানত উত্তর গোলার্ধের ৩০ থেকে ৬০ অক্ষাংশের মধ্যে এবং আরো কতকগুলো জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, মাঝারি পরিমাণ ভস্ম যেসব অঞ্চলে পড়েছে তার মধ্যে উত্তর ভারত এবং পাকিস্তানও পড়ে; নিরক্ষীয় অঞ্চলে এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে পড়েছে সবচেয়ে কম ভস্ম। কাজেই আবহাওয়াগত বা অন্য কারণে কোন বিশেষ জায়গায় ভস্ম কেন্দ্রীভূত হয়ে বিপদের সীমা অতিক্রম করবে না এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

দ্বিতীয়ত, দেখা গিয়েছে তেজস্ক্রিয়ার প্রভাব একটি বিশেষ অঞ্চলের কৃষিব্যবস্থা, প্রধান খাদ্য, দেহ–আচ্ছাদন, গৃহ–সংস্থান, জনসাধারণের সাধারণ স্বাস্থ্য, প্রতিরোধ–ক্ষমতা প্রভৃতির ওপরও নির্ভর করে। কাজেই সমান পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবেও বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা বিভিন্ন। এর ওপরও আবার রয়েছে বিশেষ বিশেষ তেজস্ক্রিয় পদার্থের শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশে কেন্দ্রীভূত হয়ে অঙ্গবিশেষের ক্ষতিসাধন করবার প্রবণতা।

আগামী দিনের পৃথিবীতে পারমাণবিক চুল্লির ব্যবহার, কৃষি ও চিকিৎসাক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগ ক্রমাগত বেড়েই চলবে। ইতোমধ্যে হাজার হাজার টন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করা নিয়ে গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে কোথাও কোথাও এসব বর্জ্য বাক্সবন্দী করে সমুদ্রে নিয়ে ফেলা হচ্ছে, কিন্তু তার ফলে ক্রমে ক্রমে একদিন সমুদ্রের পানি তেজস্ক্রিয় পদার্থে কলুষিত হয়ে উঠবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে লক্ষ লক্ষ গ্যালন তেজস্ক্রিয় দূষিত পদার্থ তৈরি হবে। পরমাণু–অস্ত্রের পরীক্ষা যদি অবিলম্বে বন্ধ করা না হয়, তাহলে বায়ুমন্ডলে তেজস্ক্রিয়ার প্রভাবও ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকবে। আর সকলের অজ্ঞাতে একবার যদি অনিশ্চিত বিপদসীমা ডিঙ্গিয়ে যায় তাহলে মানবজাতির পক্ষে ফিরে আসবার আর কোন পথই খোলা থাকবে না। বিখ্যাত মনীষী ব্যার্টান্ড রাসেলের ভাষায়ঃ

> While the hazards remain uncertain it is surely unwise to assess them at the lowest possible level. To diminish these hazards is a universal human interest in which all mankind shares equally. অর্থাৎ বিপদের পরিমাণ যখন অনিশ্চিত তখন তাকে নিম্নতম সীমায় ধরে নেওয়া কখনই সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। এই বিপদকে দূর করাই হল আজ দুনিয়ার মানুষের সামনে সর্বজনীন দায়িত্ব।

পরমাণু–শক্তির অশেষ সম্ভাবনাময় শান্তিপূর্ণ প্রয়োগে আস্থাবান দুনিয়ার সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই এর ধ্বংসকর প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য ব্যার্টান্ড রাসেলের মন্তব্যের সঙ্গে একমত হবেন।

[১৩৬৫/১৯৫৮]

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

মরুর দেশে বিজ্ঞান

আজ আমরা চারপাশে বিজ্ঞানের যে বিপুল ঐশ্বর্যে অভিভূত তার বিস্ময়কর সমৃদ্ধি আকস্মিক ঘটে নি। বিজ্ঞানের বর্তমান আকাশচুম্বী উৎকর্ষের পেছনে রয়েছে সভ্যতার আদি যুগ থেকে শুরু করে ইতিহাসের দীর্ঘ, সর্পিল যাত্রাপথ, দুনিয়ার দেশে দেশে অসংখ্য সত্যসন্ধানীর অক্লান্ত সাধনা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক নানা শক্তিকে জয় করার জন্য মানুষের দুরূহ প্রচেষ্টা।

আদি সভ্যতার উন্মেষ ঠিক কোথায় সবার আগে হয়েছিল সে-সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। কিন্তু আজ আমরা যে অঞ্চলকে মধ্যপ্রাচ্য বলি তার ঊষর মরু যে একদিন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার অতি প্রাচীন সভ্যতাকে লালন করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। নীল নদের অববাহিকা আর মেসোপটেমিয়ার সেই প্রাচীন সভ্যতার স্রষ্টারা কৃষি, গণিত, জ্যোতিষ, নির্মাণকৌশল প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা বিভাগে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন। মিসর আর ব্যাবিলনিয়ার এই সভ্যতার বিকাশ চিরস্থায়ী হয় নি। মধ্যপ্রাচ্যে এই দু'টি সভ্যতার আলো স্তিমিত হয়ে যাবার পর গ্রীক সভ্যতার ভাস্বর আলোকে বিকশিত হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা—দেখা মেলে থেলিস, ডেমোক্রিটাস, হিপোক্র্যাটিস, অ্যারিস্টটল প্রমুখ কালজয়ী প্রতিভার।

খ্রিস্টীয় সাল গণনা শুরু হবার আগেই গ্রীক সভ্যতার পতন ঘটে। তারপর কয়েক শতাব্দী ধরে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দেখা দেয় এক দীর্ঘ অন্ধকার যুগ। বহুদিন পর সপ্তম শতকে আবার মধ্যপ্রাচ্যের আরবদের ওপর এসে পড়ে মানবসভ্যতার ধারাকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব। গ্রীকদের দাস সমাজের জায়গায় ইসলাম প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এক নতুন সভ্যতার উদ্ভব ঘটায়। অজ্ঞানতার প্রায় অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি জনগোষ্ঠী অল্প সময়ের মধ্যে গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানকে আত্মস্থ করে জ্ঞান সাধনার একটি নিজস্ব বিশিষ্ট ধারা প্রবর্তন করে। দীর্ঘ সাত-আট শতক ধরে পূর্ববর্তী গ্রীক, চীনা ও ভারতীয় বিজ্ঞানের সংশ্লেষ ঘটিয়ে আরবের মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাতে নিজেদের মৌলিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া নতুন তত্ত্ব যোগ করেন। প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরবর্তী কালে নবজাগ্রত পাশ্চাত্যের যোগসূত্র ঘটিয়ে মানবসভ্যতার অব্যাহত বিকাশে তাঁরা পালন করেন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

দেশে দেশে বিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন ধারার পরিচয় পাওয়া যাবে দু'একটি ছোটখাট দৃষ্টান্ত থেকে। চিনির ব্যবহার চীন দেশে প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলে আমরা জানি। কিন্তু আখের রস থেকে এক ধরনের চিনি তৈরির নিয়ম খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পূর্বভারতে

আজকের বাংলাদেশ অঞ্চলে জানা ছিল। ক্রমে ক্রমে ভারত থেকে পারস্যের মধ্য দিয়ে আখের চাষ মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছায়। আরব ও মিসরীয় রসায়নবিদরা চুন ও ছাই-এর সাহায্যে আখের রস জ্বাল করে পরিষ্কার চিনি তৈরির পন্থা আবিষ্কার করেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষে ইতালীয় পর্যটক মার্কোপোলো দেখতে পান, চীন দেশে চিনি তৈরির কলগুলো চালাচ্ছে বেশির ভাগই মিসরীয় কারিগররা।

কাগজ তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় চীন দেশে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে। চীনের বাইরে প্রথম কাগজ তৈরির কল প্রতিষ্ঠিত হয় মধ্য এশিয়ার সমরখন্দে ৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে। তার পরের বছরই সমরখন্দ আরবদের অধিকারে আসে। এর পর বাগদাদে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয় ৭৯৩ সালে। আরব অধিকৃত স্পেনের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে কাগজ তৈরির কৌশল শেখে মাত্র ত্রয়োদশ শতকে।

সপ্তম শতকের শুরুতে আরবের মরুভূমিতে ইসলামধর্মের অভ্যুদয়ের পর অল্প দিনের মধ্যেই আরবদের অধিকার চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। একটি অধঃপতিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, প্রথাশাসিত সমাজে ইসলামধর্ম গণতন্ত্র, সাম্য ও জ্ঞানচর্চার এক নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে। আরবদের নতুন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অনুকূল পরিবেশও বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হয়। আরব আধিপত্যের ফলে খন্ড খন্ড নানা জাতির মধ্যে যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় তা জ্ঞানচর্চার পথ বহুলাংশে সুগম করে তোলে। বিশাল এলাকা জুড়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং তাদের আয়ত্ত জ্ঞানভান্ডার একটি সাধারণ ভাষা প্রবর্তনের ফলে হয়ে দাঁড়ায় সমগ্র অঞ্চলের সাধারণ সম্পদ।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইন্তেকাল করেন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে। তারপর মাত্র বছর দশেকের মধ্যেই ইসলামের জয়পতাকা ছড়িয়ে পড়ে উত্তরে সিরিয়া, পশ্চিমে মিসর আর পুবে পারস্য পর্যন্ত। একশ বছরের মধ্যে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা পেরিয়ে স্পেন হয়ে দক্ষিণ ফ্রান্স পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় আরবদের আধিপত্য। আর পুবদিকে তাঁদের অধিকার বিস্তৃত হয় মধ্য-এশিয়ায় সমরখন্দ পর্যন্ত। এই বিশাল এলাকা জুড়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কেন্দ্র গড়ে ওঠায় কয়েক শতাব্দী ধরে এই অঞ্চল হয়ে দাঁড়ায় দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি।

ইসলামের আবির্ভাবের বহুদিন আগেই গ্রীক সভ্যতা জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। গোঁড়া ও ধর্মান্ধ গ্রীক শাসকরা এথেন্সের বিদ্যাপীঠগুলো উঠিয়ে দিয়েছেন; সম্রাট জাস্টিনিয়ান প্লেটোর বিখ্যাত অ্যাকাডেমি বন্ধ করে দেন ৫২৯ সালে। গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে। এখানে জ্ঞানচর্চা কিছুটা চলছিল, কিন্তু তারও তখন প্রায় নিভুনিভু অবস্থা। পশ্চিম ইউরোপ তো অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু গ্রন্থ গিয়ে পৌঁছেছিল পারস্য দেশে। পারস্যের জুন্দিশাপুর শহরে আস্তানা গেড়েছিলেন এথেন্স থেকে বিতাড়িত একদল পণ্ডিত। গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষা থেকে তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই সিরীয় ও পাহ্লভি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। আরবরা পারস্য অধিকার করার পর তাঁরা এসব বই আরবিতে অনুবাদ

করার ব্যবস্থা করলেন। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে দামেশ্‌কে উমাইয়া বংশের পত্তন হয়; এঁরা প্রায় একশ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই একশ বছর প্রধানত দিগ্বিজয়ের কাল। উমাইয়াদের আমলে মুসলমানদের অধিকার সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা, চীনের সীমান্ত পর্যন্ত মধ্য এশিয়া, এবং আফগানিস্থান হয়ে সিন্ধু ও পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এসময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-এর অনুবাদে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়।

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি ক্ষমতায় এলেন আব্বাসীয়রা; আর তাঁদের সময়ে দেখা দিল আরব বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ। আব্বাসীয় বংশের দ্বিতীয় খলিফা আল-মনসুর (৭৫৪-৭৫) বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন ৭৬২ সালে। এর পরের মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাগদাদ সেকালের দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শহর হয়ে দাঁড়ায়। শুধু যে জনসংখ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য আর ঐশ্বর্যের চাকচিক্যে বাগদাদ বড় হয়ে ওঠে তা নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দিক দিয়েও বাগদাদ হয়ে ওঠে সেকালের পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু।

৭৫০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিপুল আকারে চলে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্র থেকে গ্রহণ আর আত্মসাতের পালা। এই সময়ের মধ্যে অ্যারিস্টটল, গ্যালেন, প্লেটো, টলেমি, ইউক্লিড, আর্কিমিডিস প্রমুখ গ্রীক মহারথীদের প্রায় সব বই আরবিতে ভাষান্তরিত হয়ে গিয়েছে।

আল-মনসুরের সময়ে বহু গ্রীক বিজ্ঞানীর বই আরবিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়; তার মধ্যে ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস্' (জ্যামিতিতত্ত্ব), টলেমির 'আলমাজেস্ট' (জ্যোতির্বিদ্যা) এবং হিপোক্র্যাটিস ও গ্যালেনের চিকিৎসাবিদ্যার বই-এর কথা উল্লেখ করা যায়। ৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় এক জ্যোতিষী বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই 'ব্রহ্মসিদ্ধান্তের' এক খণ্ড নিয়ে বাগদাদে হাজির হন। আল-মনসুর অবিলম্বে তারও অনুবাদের ব্যবস্থা করেন।

নবম শতকে বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-এর অনুবাদ ব্যাপক আকারে চলতে থাকে। পঞ্চম আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯) এবং তাঁর পুত্র সপ্তম আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩) গ্রীক, ভারতীয় ও অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদের কাজে বিশেষ উৎসাহ দেন। আল-মামুন গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-এর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করার জন্য বাইজান্টাইন সম্রাটের দরবারে এক প্রতিনিধিদল পাঠান। তাঁর উৎসাহে অ্যারিস্টটলের বইগুলো গ্রীক থেকে আরবিতে অনুবাদ করা হয়। এছাড়া ৮৩০ সালে তিনি বাগদাদে 'বায়তুল হিক্‌মা' (জ্ঞানগৃহ) নামে এক বিশাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এমনি সব উদ্যোগের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে বিজ্ঞানের নানা বিভাগে এমন ব্যাপক চর্চা শুরু হয় যে, দশম-একাদশ শতকে মুসলিম বিজ্ঞানীরা মূল্যবান মৌলিক আবিষ্কার করতে শুরু করেন।

এসব প্রচেষ্টা যে শুধু বিজ্ঞানের তত্ত্বগত আলোচনায় সীমাবদ্ধ থেকেছে তা নয়। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকেও সমানভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। খলিফা হারুন-অর-রশীদ বাগদাদে একটি সরকারী হাসপাতাল স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এই হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক হয়েছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল-রাজি

(৮৬৫–৯২৫)। নবম ও দশম শতকের মধ্যে মুসলিম বিশ্বে অন্তত ৩৪টি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়।

আল–মামুন ৮২৯ সালের দিকে পৃথিবীর ব্যাস মাপার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দেখলেন, দুপুরে সূর্য যখন আস্‌ওয়ান শহরে ঠিক মাথার ওপরে, তখন আলেকজান্দ্রিয়ায় সূর্য ঠিক মাথার ওপর থেকে দক্ষিণে রয়েছে ৭°১২ কোণ করে। দু'টি জায়গার মধ্যকার দূরত্ব আর এই কোণের মাপ থেকে তিনি পৃথিবীর ব্যাস হিসেব করলেন (আধুনিক এককে) ৭,৮৫০ মাইল। এই পরিমাপ বর্তমান হিসেবের চেয়ে মাত্র মাইল পঞ্চাশ কম।

প্রথম যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে রসায়নবিদ আবু মুসা জাবির ইব্‌ন–হাইয়ানের (৭২০–৮১৩) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কুফায় (বর্তমানে ইরাকের অন্তর্গত) বাস করতেন; হারুন–অর–রশীদের উজির জাফর আল–সাদিক ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু। জাবির ইব্‌ন–হাইয়ান বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালিয়ে অসংখ্য বই লিখে গিয়েছেন। জেবের নামে তাঁর বহু বই ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

জাবির ধারণা করেছিলেন, সেকালে যে ছ'টি ধাতুর (সোনা, রূপা, সীসা, টিন, তামা, লোহা) কথা জানা ছিল, তার সবগুলোরই মৌলিক উপাদান হল গন্ধক ও পারদ; গন্ধক দেয় দাহ্যতা আর রূপান্তরের গুণ, আর পারদ দায়ী ধাতব গুণাগুণের জন্য। যেমন সীসাকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে গন্ধক আর পারদ; আবার এই দু'টি উপাদানকে বিশেষ কৌশলে যুক্ত করে পাওয়া যেতে পারে সোনা। এই সোনা তৈরির স্বপ্নে বিভোর হয়ে তাঁর পরে আরো অনেকে আল–কিমিয়ার সাধনায় জীবনপাত করেছেন। কিন্তু জাবির তাঁর পরীক্ষা–নিরীক্ষায় যে নিপুণ ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতির প্রয়োগ করেন সেজন্য তিনি 'বৈজ্ঞানিক রসায়নচর্চার জনক' বলে পরিচিতি লাভ করেছেন।

জাবিরের প্রধান উদ্ভাবনের মধ্যে রয়েছে ঃ সিরকার পাতন থেকে ঘন অ্যাসেটিক অ্যাসিড তৈরি; রঙিন কাচ তৈরির উন্নত পদ্ধতি; কাপড় ও লোহা সংরক্ষণের জন্য রঙ ও বার্নিশের ব্যবহার; খনিজ থেকে আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি প্রভৃতি ধাতু শোধনের প্রক্রিয়া।

খলিফা মামুনের সময়ে একজন প্রতিভাশালী গণিতবিদের আবির্ভাব হয়—তাঁর নাম মুহম্মদ ইব্‌ন–মুসা আল–খোয়ারিজ্‌মি (সম্ভবত ৭৮০–৮৫০)। নাম থেকেই বোঝা যায় খোয়ারিজ্‌মে (বর্তমান উজবেকিস্তানের খিবা শহর) তাঁর জন্ম। মধ্যযুগের গণিতবিদদের ওপর তাঁর মতো এমন প্রভাব আর কেউ বিস্তার করতে পারেন নি।

খোয়ারিজ্‌মি ভারতীয় ও গ্রীক গণিতের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলোর যোগ সাধন করেন এবং তারপর তাঁর নিজের আবিষ্কার দিয়ে গণিতশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর মাধ্যমেই প্রধানত ভারতীয় দশমিক সংখ্যাপদ্ধতি পাশ্চাত্যের কাছে পৌঁছায় এবং গণিতচর্চায় বিপ্লব সৃষ্টি করে। বীজগণিতের উদ্ভাবনও তাঁর এক অক্ষয় কীর্তি। বীজগণিতের যে অন্য নাম 'অ্যালজেবরা' তাও এসেছে তাঁর দেওয়া নাম ('হিসাব আল–জাবর ওয়াল মুকাবালা') থেকেই। বীজগণিতের সরল ও দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধানের পদ্ধতিও তিনি বের করেন।

মামুনের সময়ে আল-কিন্দি (৮১৩-৮০) নামে আর এক বিজ্ঞানী আলোকতত্ত্বের ওপর বই লেখেন। এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে চক্ষুরোগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল; সেজন্য চোখ ও আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু আরব বিজ্ঞানী চর্চা করেছেন। আল-কিন্দি জোয়ার-ভাটা, রঙধনু প্রভৃতি বিষয়েও মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন।

সেকালের বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল-রাজির নাম আগে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। এঁর পুরো নাম আবু-বকর মুহম্মদ ইব্‌ন-জাকারিয়া আল-রাজি। ইনি রায় (বর্তমান তেহরান নগরীর কাছে) নামে স্থানে ৮৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন; তবে অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন বাগদাদে। আল-রাজির অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে প্রধান হল 'আল-হাবাই' নামে বিশাল চিকিৎসাকোষ। তিনি চক্ষুরোগ, বসন্ত ও হাম রোগ সম্বন্ধে মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কার করেন; বসন্ত ও হামের যথাযথ বর্ণনা তিনিই প্রথম দেন। ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাবার জন্য 'প্লাস্টার কাস্ট' তৈরির পদ্ধতিও তিনি উদ্ভাবন করেন। আল-রাজি শুধু যে চিকিৎসাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তা নয়, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নতত্ত্বেরও ব্যাপক চর্চা করে তার বিস্তারিত ফলাফল লিখে গিয়েছেন।

বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে মেঘহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে আরবের লোকেরা চিরদিনই নক্ষত্রজগতের রহস্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। বাণিজ্যপ্রিয় দূরদূরান্তগামী আরবদের কাছে নক্ষত্রলোকের আকর্ষণ চিরকালের। মুসলিম বিজ্ঞানীরাও গোড়া থেকেই জ্যোতির্বিদ্যার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রথম যুগের মুসলিম জ্যোতির্বিদদের মধ্যে আল-ফারঘানি (মধ্য-এশিয়ার ফরঘানায় জন্ম) এবং আল-বাত্তানির (মেসোপটেমিয়ার বাত্তানে জন্ম, সম্ভবত ৮৫৮-৯২৯) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে যেসব মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন তা ইউরোপের রেনেসাঁ যুগে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ব্যবহার করেছিলেন। উন্নত যন্ত্রপাতি ও উন্নত গণিতপদ্ধতি ব্যবহার করে আল-বাত্তানি দিনের দৈর্ঘ্যের যে হিসেব বের করেন তার সাহায্যেই সাতশ বছর পরে সংশোধিত 'গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার' তৈরি হয়।

দশম শতকের শুরুতে বাগদাদে একদল বিজ্ঞানী এক গোপন সংস্থা স্থাপন করে জনপ্রিয় ভাষায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রচার করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা এর নাম দেন 'ইখ্‌ওয়ানুস সাফা' (পবিত্রতা ও আন্তরিকতার সংঘ)। এঁদের কর্মকেন্দ্র পরে বসরায় স্থানান্তরিত হয়। তাঁরা জোয়ার-ভাটা, ভূমিকম্প, গ্রহণ, শব্দতরঙ্গ প্রভৃতি নানা বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে ৫২ খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এঁরা এমন মত প্রকাশ করেন যে, যুগে যুগে পৃথিবীতে জলবায়ু ও পরিবেশের নানা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। শস্য-শ্যামল উর্বর শ্রলাকা পরিণত হচ্ছে মরুভূমিতে, কোথাও সমুদ্রের পানিতে ডুবে যাচ্ছে ডাঙ্গা, আবার অন্য কোথাও সমুদ্র থেকে জেগে উঠছে মাটি।

দশম শতকের শেষদিকে মুসলিম প্রভাবে সুদূর পশ্চিমে স্পেন দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। কর্ডোভা হয়ে দাঁড়ায় 'জগৎ-মণি'—ইউরোপের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থল। এছাড়া স্পেনের গ্রানাডা, সেভিল, টলেডোতেও জ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। গ্রীক ও আরব বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ আরবি থেকে ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদ হতে থাকে। এভাবে গ্রীক বিজ্ঞান আরবি ভাষার মাধ্যমে আবার

ইউরোপে এসে পৌঁছায়। পরবর্তীকালে ইউরোপের মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইবন্ সীনা, ইব্ন রুশ্দ্ প্রমুখ মুসলিম মনীষীদের রচনা গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং ইউরোপের রেনেসাঁ বা নবজাগরণে বিশেষ সহায়তা করে। আরবরা স্পেনে ফুল ও ফলের বাগান করতে উৎসাহ দেন। ধান, আখ, কমলা ও তুলার চাষও তাঁরাই এখানে প্রবর্তন করেন।

দশম শতকের শেষে মুসলিম বিশ্বের পূর্ব প্রান্তে তিনজন বিরাট প্রতিভাশালী ব্যক্তির উদ্ভব হয়—এঁরা হলেন আলবেরুনি (৯৭৩-১০৩৯), ইব্ন সীনা (৯৮০-১০৩৭) এবং ইবনুল হাইসাম (৯৬৫-১০৩৯)। আলবেরুনি পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গজনির সুলতান মাহমুদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং শাহ্নামার কবি ফেরদৌসির সমসাময়িক ছিলেন। তিনি পাক-ভারত উপমহাদেশে এবং অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং জ্যোতির্বিদ্যার একটি বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন।

আলবেরুনি ছিলেন এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ—একাধারে চিকিৎসাবিদ, জ্যোতির্বিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, ভূগোলবিদ ও ইতিহাসবিদ। তিনি আরবি, পারসি ও সংস্কৃত এই তিনটি ভাষাই ভালভাবে জানতেন; তাঁর মাধ্যমেই ভারতীয় সংখ্যারীতি, শূন্য ও দশমিকের ব্যবহার পাশ্চাত্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশুদ্ধতা নির্ণয় করার জন্য তিনি ১৮ রকম ধাতু ও বিভিন্ন মণিমুক্তার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিখুঁতভাবে হিসেব করে বের করেন। প্রাকৃতিক ঝর্না ও আর্টেজিয় কূয়ার কারণ যে মাটির তলার পানির চাপ এ ব্যাখ্যাও তিনি দেন। সিন্ধু উপত্যকা এককালে সমুদ্রের তলায় ছিল বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে খ্যাতনামা মুসলিম বিজ্ঞানী আবু আলী আল-হুসেন ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন সীনা ৯৮০ সালে বোখারার কাছে (বর্তমান উজবেকিস্তানে) জন্মগ্রহণ করেন। ১০৩৭ সালে হামাদানে (বর্তমান ইরানে) তাঁর মৃত্যু হয়। ইব্ন সীনা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা করে প্রায় একশ গ্রন্থ রচনা করেন কিন্তু মধ্যযুগের সবচেয়ে খ্যাতিমান চিকিৎসাবিদ হিসেবেই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি 'আল-কানুন ফিল তিব' (বা চিকিৎসাবিধি) নামে চিকিৎসাবিদ্যার যে বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন তা উইলিয়াম হার্ভের সময় পর্যন্ত ছ'শ বছর ধরে ইউরোপের সবচেয়ে প্রামাণ্য চিকিৎসাগ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়। পঞ্চদশ শতকের শেষ তিরিশ বছরে ল্যাটিনে অনূদিত কানুনের ১৬টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়; ষোড়শ শতকে হয় ২০টির বেশি সংস্করণ। এ বইতে চর্মরোগ ও অন্যান্য রোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ও ৭৬০ রকম ওষুধের বর্ণনা রয়েছে। যক্ষ্মা যে ছোঁয়াচে রোগ আর পানির মাধ্যমে নানা রকম রোগ ছড়াতে পারে তা ইব্ন সীনাই প্রথম বের করেন।

বিজ্ঞান ও দর্শনের অন্যান্য বিভাগেও ইব্ন সীনার অসামান্য অবদান রয়েছে। 'কিতাবুল শিফা' (বা নিদানশাস্ত্র) নামে তিনি একটি দার্শনিক বিশ্বকোষ রচনা করেন। এতে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে, বিশেষ করে সংগীতের শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। সূক্ষ্ম পরীক্ষার সাহায্যে তিনি বহু বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বের করেন। আল-কিমিয়ার সাহায্যে নিকৃষ্ট ধাতু থেকে সোনা তৈরি সম্ভব একথা ইব্ন

সীনা বিশ্বাস করতেন না; তাঁর মতে বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নানা খনিজ সম্পর্কে তার বর্ণনা বহু যুগ পর্যন্ত ব্যবহৃত হতে থাকে। তিনি পর্বত সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে কতকগুলো তত্ত্ব উল্লেখ করেন।

মধ্যযুগের সবচেয়ে খ্যাতিমান পদার্থবিদ আবু আলী আল-হাসান ইবনুল হাইসাম ৯৬৫ সালে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন; আর ইন্তেকাল করেন ১০৩৯ সালে কায়রোতে। তিনি বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ও পরীক্ষামূলক চর্চার মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁর রচনা ষোড়শ শতকে ল্যাটিনে অনূদিত হয় এবং লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি, ইওহান কেপলার, আইজাক নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীর গবেষণায় প্রভাব বিস্তার করে।

আল-হাইসামের গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল আলোকতত্ত্ব। এ বিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণনা দিয়ে তিনি 'কিতাব আল-মানাজির' (বা আলোকতত্ত্ব) নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর আগে গ্রীক পণ্ডিত ইউক্লিড (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক) আর টলেমি (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক) বলেছিলেন, চোখ থেকে একরকম রশ্মি বেরিয়ে দৃশ্যমান বস্তুতে পড়ে, তাতেই আমরা সে-সব বস্তু দেখতে পাই। আল-হাইসাম এই তত্ত্বের বিরুদ্ধতা করে প্রচার করলেন, দীপ্তিমান উৎস থেকে আলো কোন কিছুর গায়ে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে, তাই আমরা সেই বস্তুকে দেখি। সেকালের অধিকাংশ পণ্ডিত আল-হাইসামের মত মানতে চান নি; কিন্তু আলবেরুনি ও ইব্‌ন সীনা তাঁকে সমর্থন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি 'আলোকতত্ত্বের জনক' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

আল-হাইসাম ইস্পাতের সাহায্যে নানা ধরনের বক্র আয়না তৈরি করে আলোর প্রতিফলন নিয়ে পরীক্ষা করেন। আলোর প্রতিসরণ সম্বন্ধেও তিনি বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এসব পরীক্ষা থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে, অপেক্ষাকৃত ঘন মাধ্যমের তুলনায় হালকা মাধ্যমে আলোর বেগ বেশি আর বিভিন্ন মাধ্যমে বেগের এই তারতম্যই আলোর প্রতিসরণের কারণ। প্রতিসরণের ফলে আলোর পথ কি পরিমাণে বেঁকে যায় তাও তিনি মেপেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিসরণের নিয়মগুলো তিনি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি। এর প্রায় ছ'শ বছর পরে ওলন্দাজ গণিতবিদ স্নেল (Snell) এই নিয়মগুলো প্রকাশ করেন। সূর্য ওঠার আগে আকাশ আলোকিত হয়ে ওঠার কারণ যে বাতাসের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলোর প্রতিসরণ এ ব্যাখ্যা আল-হাইসাম দেন। খুব ছোট ছিদ্রের ভেতর দিয়ে আলো গেলে পেছনে প্রতিবিম্ব পড়ে এটাও তিনি লক্ষ্য করেন; এথেকেই পরে ক্যামেরার উদ্ভব হয়েছে।

পারস্যের নিশাপুরের ওমর খইয়ামকে (সম্ভবত ১০৩৮-১১২৩) আমরা সচরাচর বিখ্যাত কবি হিসেবে জানি। কিন্তু তিনি আরবি ভাষায় জ্যোতির্বিদ্যা, বীজগণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে যেসব মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন তার কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। সলজুক বংশের সুলতান জালালউদ্দীনের জ্যোতির্বিদ হিসেবে ১০৭৫ সালে তিনি প্রচলিত বর্ষপঞ্জি গণনার উন্নতি সাধন করেন। মনে হয় তাঁর সময়ে তিনিই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় গণিতবিদ ছিলেন।

দশম শতক থেকেই মুলিম সভ্যতার অবনতির সূচনা হয়েছিল। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য কলহপরায়ণ ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ হয়ে যেতে থাকে। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি ধর্মের গোঁড়ামি বিশেষভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা, স্বাধীন

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং সাধারণভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় ভাটা পড়ে। এসময়ের সবচেয়ে খ্যাতিমান জ্ঞানসাধক ইব্‌ন রুশ্‌দ্‌ (১১২৬-৯৮) স্পেনের কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রধানত অ্যারিস্টটলের গ্রীক দর্শনের ভাষ্যকার ও উত্তরসূরী হিসেবে তাঁর খ্যাতি কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রেও তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেন, বিশ্বের সব কিছু অকস্মাৎ সৃষ্টি হয়েছে এমন মনে হয় না; বরং সব জিনিস ক্রমে ক্রমে নিজের রূপ বদ্‌লে অন্য রূপ গ্রহণ করছে অর্থাৎ পরিবর্তনশীল বিশ্বে সৃষ্টি অনবরতই ঘটছে। তাঁর এই মতামতে ক্রমবিকাশবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

এদিকে ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে পশ্চিমে খ্রিস্টান ও পুবে মোঙ্গল ও তাতারদের অভিযান শুরু হয়। চেংগিস খান ও তাঁর পৌত্র কুবলাই খান এশিয়া ও ইউরোপের বিশাল এলাকা জুড়ে মোঙ্গল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্ধর্ষ মোঙ্গল সেনাপতি হুলাগু খান তাঁর তাতার সেনাদল নিয়ে ১২৫৮ সালে বাগদাদ নগরী লুণ্ঠন করেন। সেই সঙ্গে বহু মূল্যবান আরবি পুথিপুস্তক ধ্বংস হয়ে যায়। ১৪০১ সালে তাইমুর লঙ বাগদাদের এই ধ্বংস সম্পূর্ণ করেন।

হুলাগু খান বাগদাদের পাঠাগারগুলো ধ্বংস করলেও আজারবাইজানের অন্তর্গত মারাগাতে তিনি একটি মানমন্দির তৈরি করেন এবং খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ নাসিরউদ্দীন তুসিকে (১২০১-১২৭৪) তার পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেন। এই মানমন্দিরে চার লক্ষের ওপর বই সংগ্রহ করা হয়। নাসিরউদ্দীন তুসি টলেমির আলমাজেস্ট গ্রন্থে বর্ণিত গ্রহদের ভ্রমণপথ সংক্রান্ত মতের সমালোচনা করেন। এর ফলেই পরবর্তীকালে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মত প্রচারের পথ প্রশস্ত হয়।

নাসিরউদ্দীন তুসির শিষ্য কুতুবুদ্দীন শিরাজি (১২৩৬-১৩১১) রঙধনুর কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, হাওয়ায় যে ছোট ছোট পানির কণা ভেসে থাকে তাতে সূর্যের আলোর দু'বার প্রতিসরণ ও একবার অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে মুখ্য রঙধনু তৈরি হয়; আর দু'বার প্রতিফলন ও দু'বার অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে সৃষ্টি হয় গৌণ রঙধনু।

তাইমুর লঙের পৌত্র উলুগ বেগ ১৪২০ সালের কাছাকাছি সমরখন্দে সেকালের দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা মানমন্দির তৈরি করেন। এখান থেকেই ১৪৩৭ সালে সৃষ্টি হয় 'জিয উলুগ বেগ' নামে বিখ্যাত নক্ষত্রতালিকা। এরপর কয়েক শতাব্দী ধরে এটি সারা দুনিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নক্ষত্রতালিকা বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এসময়ে মধ্যপ্রাচ্যের যে অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে সিরিয়ার জীববিজ্ঞানী ইবনুল নাফিসের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি চিকিৎসাবিদ্যা, বিশেষ করে চোখের রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। হৃৎপিন্ড, শিরা ও ধমনীর সাহায্যে আমাদের দেহে কিভাবে রক্ত সঞ্চালন ঘটে তা খুব সম্ভব ইবনুল নাফিসই প্রথম বর্ণনা করেন। তবে সাধারণত রক্ত সঞ্চালন আবিষ্কারের কৃতিত্ব উইলিয়াম হার্ভেকে দেওয়া হয়।

স্পেনের মালাগার বাসিন্দা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ ইবনুল বায়তার (মৃত্যু ১২৪৮, দামশ্‌কে) উদ্ভিদতত্ত্ব, ওষুধ হিসেবে উদ্ভিদের ব্যবহার এবং খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে নানারকম গবেষণা করেন। তিনি সারা স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা এবং পরে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর ভ্রমণ করে রোগ নিরাময়কারী উদ্ভিদের সন্ধান করেন।

পঞ্চদশ শতকের পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে বিজ্ঞানের চর্চায় আর তেমন নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। যেন সেখানে এক অন্ধকার যুগ নেমে আসে; আর এদিকে

ইউরোপের অন্ধকার যুগ কেটে গিয়ে সেখানে রেনেসাঁর আবির্ভাব শিল্পে, বিজ্ঞানে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে।

রেনেসাঁ যুগে ও তার পরে ইউরোপে জ্ঞানচর্চার বিপুল বিকাশ প্রধানত আরব বিজ্ঞানের প্রভাবকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। আরবদের মাধ্যমেই ইউরোপের দরবারে পৌঁছায় মানবসভ্যতার জ্ঞানভান্ডার।

চুম্বকশলাকা উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে এ তত্ত্ব আবিষ্কারের কৃতিত্ব সম্ভবত চীনাদের। কিন্তু দশম ও একাদশ শতকে আরব নাবিকরাই প্রথম সমুদ্রে জাহাজ চালাবার জন্য চুম্বকশলাকা ব্যবহার করেন। এর ফলে বিশ্বের চতুর্দিকে নিরাপদে সমুদ্রযাত্রা সম্ভব হয়ে ওঠে।

আরবরা পৃথিবীর গোলকত্ব সম্বন্ধে জেনেছিলেন গ্রীক পন্ডিত টলেমির রচনা থেকে। পৃথিবী গোল এ ধারণা কলম্বাস প্রথম পেয়েছিলেন স্পেনে আরবি বই থেকে; আর এ থেকেই ভারত সন্ধানে পশ্চিম দিকে সমুদ্রযাত্রার পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। কলম্বাসের এই অভিযানের ফলেই আমেরিকা মহাদেশে 'নতুন বিশ্ব' আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

সেকালে মুসলিম বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানচর্চার পথ স্বভাবতই সহজ ছিল না। অ্যারিস্টটলের প্রভাবে আচ্ছন্ন পন্ডিত সমাজে জ্ঞানচর্চা হয়ে দাঁড়িয়েছিল গ্রীক মনীষীদের মতামতের চর্বিতচর্বণ। এই বিপুল গ্রীক প্রভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বাধীন অনুসন্ধান চালানো, খ্যাতিমান গ্রীক পন্ডিতদের মত খন্ডন করে নতুন সত্যের সন্ধান ছিল অতি দুরূহ। তাঁদের সামনে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঐতিহ্য ছিল অতি সীমিত, পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছিল প্রায় অনুপস্থিত। পদে পদে পর্বতপ্রমাণ বাধা অপসারণ করে তাঁদের এগোতে হয়েছে।

প্রথম যুগের এই সব অভিযাত্রী বিজ্ঞানীদের তাঁদের মতামতের জন্য নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছিল যথেষ্ট। শুধু যে প্রথাসিদ্ধ পান্ডিত্যের বিরোধিতা ছিল তা নয়; খামখেয়ালি, কলহপরায়ণ, ক্ষমতালিপ্সু রাজন্যদের রোষ এবং ধর্মান্ধ শাস্ত্রকারদের বিরুদ্ধতারও সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁদের অনেককেই। মিসরের উদ্ধত খলিফা আল-হাকিমের ক্রোধবহ্নি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইবনুল হাইসামকে তাই মস্তিষ্কবিকৃতির অভিনয় করতে হয়েছে। ইব্‌ন সীনাকে রাজরোষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বারবার আত্মগোপন করতে হয়েছে; শারীরতত্ত্বের জ্ঞানলাভের জন্য শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হয়েছে তাঁকে অতি গোপনে; অভিযুক্ত হতে হয়েছে 'নাস্তিকতার' অপরাধে। জ্ঞানসাধনার 'অপরাধে' ইব্‌ন রুশ্‌দ্‌কে কারারুদ্ধ হতে হয়েছে; অবশেষে কর্ডোভা ছেড়ে স্বেচ্ছানির্বাসন নিতে হয়েছে মরক্কোতে। রাজকীয় ফরমানে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে তাঁর রচনা।

বলা বাহুল্য, এধরনের বিরুদ্ধতার সামনে এই মনীষী বিজ্ঞানীরা আত্মসমর্পণ করেন নি। শত বিপত্তি সত্ত্বেও অনুসন্ধিৎসা, সত্যসন্ধান আর জ্ঞান সাধনার অনির্বাণ আলো জ্বালিয়ে তাঁরা মানবসভ্যতার ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন। আজকের দিনের মানুষ আমরা তাঁদের এই একাগ্র সাধনার উত্তরসূরী; আর তাঁরা আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির পথিকৃৎ।

[১৩৭৭/১৯৭০]

আইনস্টাইনের আবিষ্কার

সাধারণ মানুষের কাছে, বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে ঘিরে আছে এক রহস্যের জগৎ। উড়োচুলে ভরা মাথা, স্বপ্নদৃষ্টি চোখ, শিশুর মতো সরল এই আত্মভোলা মানুষটি এবং তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বকে নিয়ে কত যে আজগুবি, মনগড়া কাহিনী ছড়িয়েছে তার ইয়ত্তা নেই! আর সে সবেরই মূল সুরটা হল ঃ আইনস্টাইন আমাদের আশেপাশের দুনিয়ার কেউ নন, সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য এক অলৌকিক রহস্যের জগতে তাঁর আনাগোনা।

এমনকি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে যাঁরা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব নিয়ে কিছুটা নাড়াচাড়া করেছেন তাঁদের কাছেও আইনস্টাইন হলেন এমন এক অঙ্কের জাদুকর যিনি বলেনঃ আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চতুর্থ মাত্রা বলে একটা জিনিস আছে! আমাদের আশেপাশের সব জিনিস সময় সময় খাটো হয়, লম্বা হয়; দুনিয়াটা বেলুনের মতো চুপসে যায়, আবার ফুলে-ফেঁপে ওঠে; অর্থাৎ কিনা সে দুনিয়ার সব কিছুই বিদঘুটে রকম আপেক্ষিক এবং রহস্যময়। আর আইনস্টাইনের এই কিম্ভূত বিচিত্র আপেক্ষিক জগৎ থেকে একদিন হঠাৎ বেরিয়ে আসে পরমাণু-বোমার প্রলয় হুঙ্কার।

আইনস্টাইন চারপাশে এমনি রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টির পেছনে দুটো কারণ থাকতে পারে। এক হল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং বিজ্ঞানীদের যুক্তিপদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ মানুষদের অজ্ঞতা। বাস্তব জীবনে আমরা যে সাধারণ জ্ঞানের যুক্তি দিয়ে দৈনন্দিন কাজ চালাই, বিজ্ঞানীদের যুক্তিধারা স্বভাবতই তার চেয়ে খানিকটা মার্জিত এবং সূক্ষ্ম, তাই সাধারণ বুদ্ধিতে সেটা সবসময় অনুসরণ করা সহজসাধ্য হয় না। আধুনিক সংবাদজগতের রোমাঞ্চ সৃষ্টির নেশা একে কাজে লাগায়। বিজ্ঞানী এবং তাঁদের আবিষ্কারকে করে তোলা হয় সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এক অলৌকিক জগতের সামগ্রী।

দ্বিতীয় কারণ হতে পারে উদ্দেশ্যমূলক। বিজ্ঞানী, বিশেষ করে খুব নামজাদা বিজ্ঞানী, যদি বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্যের সঙ্গে প্রচলিত সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েও মাথা ঘামাতে শুরু করেন তাহলে বিশেষ বিশেষ মহলের কাছে সেটা মোটেই প্রীতিপ্রদ হবার কথা নয়। সে বিজ্ঞানীকে কল্পরাজ্যের জীব প্রতিপন্ন করা, তাঁকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলার একটা শোভন এবং শালীন পন্থা মাত্র। নাৎসীনেতা হিটলারের বড় একটা শালীনতাবোধ ছিল না, তাই জীবিত অথবা মৃত যে-কোন অবস্থায় আইনস্টাইনের মস্তক এনে দেবার জন্য এক হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা

করতে তার বাধে নি। আইনস্টাইন যে শেষ জীবনে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিলেন, তার পেছনে মনে হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ খানিকটা কাজ করেছিল।

কিন্তু আসল কথাটা হল, আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতত্ত্ব থেকে জগতের যে ছবি তুলে ধরেছেন সে কি সত্যি সত্যি এক কিম্ভূত দুর্বোধ্য রহস্যময় জগতের? একথা সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা আইনস্টাইনের মতবাদ যদি সত্যি সত্যি শুধু এক অলৌকিক কাল্পনিক জগতের মতবাদ হত, দু'চারজন মহাপন্ডিত ও গণিতবিদ বিজ্ঞানীর বাইরে সাধারণ মানুষের কাছে তার কিছুমাত্র আবেদন না থাকত তাহলে আইনস্টাইনের তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিপুল আলোড়ন এনেছে, দুনিয়াজোড়া যে সম্মান এবং স্বীকৃতি পেয়েছে, তা কিছুতেই সম্ভব হত না।

আইনস্টাইন এক ডাকসাইটে গণিতবিদ, এক অলৌকিক কৌশলে তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্যকে আয়ত্ত করেছেন, এভাবে দেখলে সত্যিকার আইনস্টাইনকে বুঝতে পারা যাবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্বের মূলনীতি ঘোষণা করার কিছুদিন পর সে-সময়ের বিখ্যাত গণিতবিদ মিন্‌কৌস্‌কি (Minkowski) যখন তাকে বিবর্ধন করে দেশকালের গাণিতিক ব্যাখ্যা দিলেন, তখন আইনস্টাইন বলেছিলেনঃ 'গণিতজ্ঞরা আপেক্ষিক তত্ত্বের এলাকায় পা দিতে আরম্ভ করেছেন, আমি নিজেই এখন আর এর কিছু বুঝতে পারছি না।'

অলৌকিক প্রতিভা বা গভীর গণিতবিদ্যার জোরে নয়, তাহলে কিসের জোরে আইনস্টাইন তাঁর যুগান্তকারী মতবাদ গড়ে তুললেন? —আইনস্টাইনের ছিল এক আশ্চর্য জিজ্ঞাসু মন; আর সহজ, স্পষ্টভাষায় যুক্তি তুলে ধরবার ক্ষমতা। তিনি ১৯০৫ সালে প্রথম আপেক্ষিকতত্ত্ব ঘোষণা করেন, তখন তাঁর সে রচনা মোটেই কেতাবি তথ্যের নজির বা ফুটনোট ভারাক্রান্ত ছিল না। অতি আশ্চর্য সরল যুক্তি এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি মানুষের যুগ যুগ ধরে গড়ে তোলা বিশ্ব-প্রকৃতির ধারণাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন।

অথচ আইনস্টাইনের সে-তত্ত্ব মানুষের যুগ যুগের জ্ঞান-ভান্ডারেরই স্বাভাবিক পরিণতি, তাতে অলৌকিকত্বের কিছু নেই। চিরাচরিত প্রথায় যে-সব ধারণাকে এতদিন ধরে নেওয়া হচ্ছিল শাশ্বত সত্য বলে, উন্নত আধুনিক বিজ্ঞানের নিপুণ পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যের সঙ্গে বাধছিল তার সংঘাত। এতদিন এ সংঘাত বাধে নি, তার কারণ এর আগে কখনো আজকের মতো এত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্র উদ্ভাবিত হয় নি এবং পুরনো যুগের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা থেকে যে-সব তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তাকে পুরনো ধারণা দিয়ে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করতে কোন অসুবিধে ঘটে নি।

আইনস্টাইন এসে দেখালেন সেই যুগ যুগের স্থান-কালের পুরনো ধারণার গলদ এবং সহজ-স্বচ্ছ যুক্তি দিয়ে বোঝালেন আমাদের আগেকার ধারণাগুলোকে আগাগোড়া পাল্‌টে না ফেললে আজকের দিন পর্যন্ত পরীক্ষালব্ধ সমস্ত তথ্যকে সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন উঠবে, আইনস্টাইনের যুক্তি এবং বিচার পদ্ধতি যদি এত সহজ এবং স্বচ্ছ হবে, তাহলে তা আমাদের কাছে এত দুর্বোধ্য কেন, আর তাকে বোঝার জন্য এত জটিল আঁকজোখেরই বা প্রয়োজন কি?

উত্তর সহজ। পুরনো চিন্তার ঝোঁকটা ছিল কতকগুলো জিনিসকে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহন করে নেওয়ার দিকে, তাতে সাধারণ মোটামুটি নিয়মগুলো চটপট বেরিয়ে আসে। কিন্তু অনেকগুলো জিনিস আগে স্বতঃসিদ্ধ ধারণা করে এগনো আসলে অস্পষ্ট, অপরিণত চিন্তার লক্ষণ। যদি আমরা ধারণা করে নিই, প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটে সে-সবেরই পেছনে কোন এক অলৌকিক স্বতঃসিদ্ধ কারণ রয়েছে, তাহলে হিসেব করে প্রকৃতির নিয়ম-কানুন বের করবার আর কোন প্রয়োজনই থাকে না।—কিন্তু এ হল অবৈজ্ঞানিক চিন্তা। আইনস্টাইনের তত্ত্বে স্বতঃসিদ্ধ ধারণা বা অনুমান (assumption) কম। এ হল প্রকৃতির নিয়ম বের করবার সব চাইতে বৈজ্ঞানিক, সব চাইতে সহজ, সরাসরি পথ। তাই তাতে হিসেব কষে বের করবার প্রয়োজন বেশি। যুক্তির শৃঙ্খল ধরে জটিল অঙ্কের প্রয়োজনও সেই জন্য।

তাহলে গণিতের সাহায্য ছাড়া আইনস্টাইনের মতবাদের কি কিছুই বুঝতে পারা যায় না? যায়, কিছুটা যায়—যেমন যায় উঁচুদরের সংগীতের জটিল কলাকৌশল কিছুমাত্র না জেনেও তার মাধুর্য উপভোগ করা। তবে উপলব্ধির স্তরভেদ আছে। সংগীত বা যেকোন মহৎ শিল্প-সৃষ্টির যেমন কতকগুলো কলাকৌশল আছে যাকে আয়ত্ত না করলে উপলব্ধি পরিপূর্ণ হয় না, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরও তেমনি আছে; সে কলাকৌশলের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হল গণিত। গণিতের একটি ছোট সমীকরণের সাহায্যে যে সত্য প্রকাশ করা যায়, সাধারণ ভাষায় তা ব্যাখ্যা করতে হলে বিপুল পরিমাণে যুক্তিজাল বিস্তার করতে হবে কেননা গণিত হল মানুষের যুক্তি-বিন্যাস প্রয়াসের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পরিণতি, আর তাই বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের এক অমোঘ হাতিয়ার।

আইনস্টাইন কি করে বিশ্ব-প্রকৃতি সম্বন্ধে আগেকার ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন সে-কথা বুঝতে হলে আগেকার ধারণার কথাটা মোটামুটি জানা থাকা দরকার।

আইনস্টাইনের আগে দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী ছিলেন স্যার আইজাক নিউটন। তাঁর আগে আর্কিমিডিস, কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও প্রমুখ আরো বহু বড় বিজ্ঞানী জন্মেছেন, কিন্তু সতের শতকের শেষদিকে নিউটনই প্রথম যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-ভান্ডারকে সুসংবদ্ধ করে বিশ্ব-প্রকৃতির একটা পরিপূর্ণ চিত্র গড়ে তোলেন। গতিবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর নিয়মের সূত্রগুলো খুবই সহজঃ

১. প্রত্যেক বস্তুর একটা জড়তা গুণ আছে। বাইরে থেকে অন্য কোন শক্তি প্রয়োগে বিচ্যুত না করা পর্যন্ত, বস্তুটি যদি স্থির অবস্থায় থাকে তাহলে অনন্তকাল স্থির অবস্থাতেই থাকবে; যদি একটানা গতিতে চলতে থাকে তাহলে অনন্তকাল একটানা সরল গতিতে চলতেই থাকবে। অর্থাৎ কোন বস্তু নিজে থেকে নিজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় না।

২. বাইরে থেকে কোন শক্তি প্রয়োগ করলে সেই শক্তি প্রয়োগের নির্দিষ্ট দিকে বস্তুর স্থির অবস্থার বা একটানা গতিশীল অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কতখানি শক্তি প্রয়োগ করা হল সেটা জানতে পারা যায় বস্তুর জড়তা বা বস্তুমান এবং গতি পরিবর্তনের হারের বা ত্বরণের (acceleration) গুণফল থেকে।

৩. প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

এই ক'টি অতি সহজ নিয়মের সঙ্গে নিউটন যোগ করলেন তাঁর বিখ্যাত মহাকর্ষের তত্ত্ব। বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করছে তার নিজের দিকে আর এই টানের পরিমাণ নির্ভর করছে তাদের উভয়ের বস্তুমানের এবং পরস্পরের মধ্যকার দূরত্বের বর্গের ওপরে।

মনে হল এই ক'টি সূত্রের মধ্যে বিশ্বের সমস্ত নিয়ম লেখা হয়ে গিয়েছে। আকাশের নক্ষত্র ও গ্রহলোক থেকে যে কোন বস্তুকণিকার গতি-প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা গেল এই ক'টি সহজ নিয়ম থেকে। নিঃসীম শূন্যের মধ্যে বিশ্বের বস্তুকণা অনন্তকাল ধরে ভেসে বেড়াচ্ছে; তাদের মধ্যে কাজ করছে শুধু মহাকর্ষ আর নিউটনের গতিবিদ্যার নিয়ম। এই যান্ত্রিক বিশ্বজগতের রূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা ক্রমে ক্রমে এতখানি আস্থাবান হয়ে উঠলেন যে, বলা হল, যে কোন মুহূর্তে দু'টি বস্তুকণার অবস্থান এবং বেগ যদি নির্দিষ্ট করে জানা যায় তাহলে হিসেব কষে তাদের ভূত-ভবিষ্যৎ সবই বের করে দেওয়া সম্ভব।

সতের শতকের শেষদিক থেকে নিউটন এবং তাঁর পরবর্তী অন্যান্য বিজ্ঞানী এমন সাফল্যের সঙ্গে বিশ্বের সব সমস্যার সমাধান করলেন যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত নিউটনের গড়ে তোলা বিজ্ঞানের কাঠামো সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার কিছুই রইল না। এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে মানা হয়ে গিয়েছিল যে, নিউটন চূড়ান্তভাবে বিশ্বের গভীরতম সত্য উদ্‌ঘাটন করে গিয়েছেন। মূল নিয়ম সম্বন্ধে জানবার কিছুই আর বাকি নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রমাগত অগ্রগতির ফলে উনিশ শতকের শেষ দিকে অবশেষে বিপদ দেখা দিল। নিউটনের চিন্তাধারা বা নিয়ম দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পরীক্ষায় পাওয়া তথ্য আর ব্যাখ্যা করা গেল না। তাই দেখা দিল আইনস্টইনের তত্ত্ব। আইনস্টাইন নিউটনের কল্পিত বিশ্বপ্রকৃতির ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে ফেললেন।

নিউটনের ধারণা সম্বন্ধে আইনস্টাইনের প্রধান প্রধান আপত্তি কি?

আইনস্টাইনের প্রথম কথা হলঃ নিউটন গোড়াতেই স্থান, কাল, ভর, বেগ— এগুলোর একটা পরম (absolute) মানদণ্ড ধরে নিয়েছেন। কিন্তু সত্যি সত্যি সেই পরম মানদণ্ড বলে কিছু কি আছে? এ প্রশ্ন আগে আর কেউ কখনো করে নি—কেননা সাধারণ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে এরকম প্রশ্ন কারো মাথায় আসে নি; কিন্তু আইনস্টাইন এ-প্রশ্ন তুললেন।

ধরা যাক, পরম গতির কথাটাই। কেউ যদি বলে ঘন্টায় ৫০ কিলোমিটার বেগে মোটরটা ছুটছে, আর তাকে যদি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয় ঘন্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার কার সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে—তাহলে সে নিশ্চয়ই বেজায় রকম অবাক হবে। কিন্তু প্রশ্নটার অর্থ আছে। রাস্তার ধারে যদি একজন লোক দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তার সঙ্গে তুলনায় মোটরের বেগ ঘন্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার ঠিকই। কিন্তু অন্য একজন যদি আরেকটা মোটরে চেপে একই বেগে উলটো দিকে ছুটতে থাকে, তাহলে তার কাছে মনে হবে আগের মোটরটা ছুটে যাচ্ছে ঘন্টায় একশ কিলোমিটার বেগে। আবার আগের মোটরের ভেতরে যে লোকটি বসে আছে তার তুলনায় মোটরের বেগ কি?— শূন্য। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, কোন জিনিসের বেগের ধারণা দর্শকের নিজের অবস্থার ওপরে নির্ভর করে। তবু নাছোড়বান্দা কেউ হয়তো যুক্তি তুলবেন, কিন্তু আমরা মোটরের

আসল বেগ ধরব ঘন্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার, কেননা আশেপাশের সব স্থির জিনিস, রাস্তা অর্থাৎ পৃথিবীর সঙ্গে তুলনায় এই তার বেগ।

কিন্তু পৃথিবীই কি স্থির? এই মোটরকে একজন দর্শক যদি চাঁদ কিংবা সূর্য থেকে দেখে (যদি অবশ্য সেভাবে দেখা আদৌ সম্ভব হয়!) তাহলে তার কাছে এর বেগ কত বলে মনে হবে? সূর্যের চারপাশে গোটা পৃথিবীটা ঘুরছে সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার বেগে, কাজেই তখন তার তুলনায় মোটরের গতি কি দাঁড়ায়? সূর্যও আবার স্থির হয়ে নেই, সেও ছুটে বেড়াচ্ছে তারার জগতের মধ্য দিয়ে। আবার সব তারা অন্য তারাদের তুলনায় ক্রমাগত আপেক্ষিকভাবে স্থান পরিবর্তন করে চলেছে। অর্থাৎ বিশ্বে এমন একটিও স্থির বিন্দু নেই যার তুলনায় কোন জিনিসের পরমগতি বের করা যেতে পারে। কাজেই পরীক্ষার সাহায্যে পরম গতি বের করা এক অসম্ভব কল্পনা।

পরম গতির ধারণাকে মজবুত করবার জন্য বিজ্ঞানীরা কল্পনা করেছিলেন সর্বভূতে ব্যাপ্ত এক স্থির ইথারের সমুদ্রের, যার ভিতর দিয়ে বিশ্বের সব কিছু ভেসে চলেছে। অথচ উনিশ শতকের শেষদিকে মাইকেলসন-মর্লির আলোক সংক্রান্ত সূক্ষ্ম পরীক্ষায় ভেসে চলার কোন নজিরই পাওয়া গেল না। এতে শুধু যে ইথারের অস্তিত্বের কল্পনাই ধসে পড়বার উপক্রম হল তা নয়, বস্তুর পরম গতির ধারণা পেল আর এক গুরুতর আঘাত।

তাহলে আইনস্টাইন কি সব গতিকেই আপেক্ষিক গতি বলে রায় দিয়েছেন? – দিয়েছেন, তবে একটি ছাড়া। পরীক্ষায় পাওয়া গেল, বিশ্বে একমাত্র আলোর বেগই হল পরম, দর্শকের নিজস্ব গতি-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ দর্শকের অবস্থা বা গতি যাই হোক না কেন, তার কাছে আলোর বেগের মান সবসময় একই থাকবে। শুধু তাই নয়, আলোর বেগ হল চূড়ান্ত বেগ—এর চেয়ে বেশি কোন জিনিসের বেগ হতে পারে না।

নিউটন ধরে নিয়েছিলেন, পরস্পর আপেক্ষিক গতিশীল দুটো কাঠামোর মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফলে কোন তারতম্য ঘটবে না। অর্থাৎ কাঠামোটা স্থির হোক অথবা গতিশীল হোক তাতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ভর, সময়ের হিসেব একই রকম থাকবে। আইনস্টাইন প্রশ্ন তুললেন, তা কি থাকবেই? কী করে বোঝা গেল যে, দৈর্ঘ্য, ভর বা কালের ধারণা পরম, এদের পরিবর্তন হবে না?

উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত কখনো এ-রকম প্রশ্ন ওঠে নি। কিংবা পরীক্ষা থেকে এ-ধরনের কোন পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় নি। তখন সাধারণত যে পরিমাণের গতি নিয়ে ছিল বিজ্ঞানের কারবার তাতে এ-পরিবর্তন ধরা পড়বার কথাও নয়। কিন্তু কোন জিনিসের বেগ যদি হয় প্রচণ্ড রকম, আলোর বেগের কাছাকাছি, তাহলেও কি তার বর্তমান দৈর্ঘ্য, সময়ের হিসেব একই থাকবে? আইনস্টাইন বললেন, থাকবে না—বেগ বাড়লে স্থির কাঠামোর তুলনায় ভর বাড়বে, দৈর্ঘ্য কমবে, সময়ের হিসেব কমবে। আলোর বেগের অর্ধেক বেগ (আলোর বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার) পর্যন্ত এই পরিবর্তন হবে খুবই ধীরে ধীরে; আলোর বেগের যত কাছাকাছি পৌঁছনো যাবে পরিবর্তন হবে তত তাড়াতাড়ি। তারপর চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছতে পৌঁছতে ভর হয়ে উঠবে অনন্ত, দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে শূন্যের কোঠায়, আর তখন সময় যাবে থেমে।

শুনতে আশ্চর্য লাগে। এও কি কখনো সম্ভব হতে পারে? কিন্তু অমোঘ আইনস্টাইনের যুক্তির তীক্ষ্ণতা, পরীক্ষালব্ধ সত্যের প্রমাণ সন্দেহাতীত। আধুনিক বিজ্ঞানে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগবিশিষ্ট পারমাণবিক কণিকা নিয়ে অনবরতই পরীক্ষা চলেছে; সেখানে মিলেছে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্তের নির্ভুল সমর্থন। আর এসব পরীক্ষা চিরদিনের জন্য ধূলিসাৎ করে দিয়েছে পুরনো দিনের পরম স্থান-কাল-গতি এবং ভরের ধারণাকে। আশ্চর্য সহজ আইনস্টাইনের জিজ্ঞাসা। উনিশ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞান বস্তু এবং শক্তিকে একেবারেই পৃথক দু'টি সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে। বেগ বাড়লে দেখা যাচ্ছে ভর বাড়ে, অথচ বেগ বাড়লে চলশক্তি বেড়ে যায় এ-তো জানা কথাই। তাহলে ভর আর শক্তির মধ্যে সম্বন্ধটা কি? —আইনস্টাইন গণিতের সূত্র দিয়ে প্রমাণ করলেন, আসলে শক্তি আর ভর একই সত্তার দুই ভিন্ন রূপ—এককে অন্যতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এই তত্ত্ব ঘোষণার চল্লিশ বছর পরে হিরোশিমা-নাগাসাকির ওপর পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ যেন প্রচণ্ড বিক্রমে আইনস্টাইনের তত্ত্বের সার্থকতা ঘোষণা করল।

আইনস্টাইন স্থান-কাল সম্বন্ধে নিউটনর পরম গতির ধারণার অবসান ঘটিয়েই শুধু ক্ষান্ত হন নি, এসব নতুন ধারণাকে সুসংহত করে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির এক নতুন রূপ গড়ে তুলেছেন।

আইনস্টাইন বলেছেন, স্থান ও কালের প্রভেদ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের যে ধারণা সে নিতান্তই আমাদের মনের তৈরি, কিন্তু যে বস্তুপুঞ্জ বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার আসল নায়ক তারা মানুষের মনের সে-সব ধারণার কথা কিছুই জানে না, তারা নিতান্ত প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে চলে মাত্র। স্থানের ব্যবধান এবং কালের ব্যবধানকে আমরা যেরকম পৃথকভাবে দেখি আসলে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা সেভাবে আলাদা করে দেখাটা নিতান্ত কৃত্রিম; বাস্তবসম্মত পদ্ধতি হল স্থান-কালের ব্যবধানকে একসঙ্গে করে দেখা। কালকে এভাবে স্থানের তিন মাত্রার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় আমাদের জগৎ হয়ে দাঁড়াল চার মাত্রার।

এই চারমাত্রার জগৎ দিয়ে আইনস্টাইন মহাকর্ষ তত্ত্বের একটা আশ্চর্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নিউটন ধরে নিয়েছিলেন, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করার একটা রহস্যময় প্রবণতা রয়েছে—তাই মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে কোন জিনিসের গতিপথ বেঁকে যায়। যেমন, একটা বলকে সমান্তরালভাবে শূন্যে ছুঁড়ে দিলে সেটা সরলপথে না দিয়ে বেঁকে মাটিতে গিয়ে পড়ে। আইনস্টাইন দেখালেন, এই রহস্যময় আকর্ষণের শক্তি কল্পনা করবার কোন প্রয়োজন নেই। আসলে বিশ্বের আসল রূপ কি, সেটা জানা দরকার। তিনমাত্রার জগতের রূপ এমন যে, তাতে বস্তুর উপস্থিতি ঘটলেই সেখানে আর ইউক্লিডের জ্যামিতি দিয়ে কাজ চলে না, স্থান (স্পেস) যায় বেঁকে, সবচেয়ে সহজ পথ হয়ে দাঁড়ায় বাঁকা রেখা; তাই মনে হয় বলটা কোন রহস্যময় আকর্ষণের টানে তার সরল পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে।

কিন্তু এরকম অদ্ভুত প্রকৃতির স্থান-কাল-বিশ্বের প্রমাণ কি? প্রমাণ পরীক্ষাতেই পাওয়া গেল। আইনস্টাইন বলেছিলেন, কোন ভারি বস্তুর অস্তিত্বের জন্যই যখন স্থান-

কাল-জগতের পথ যায় বেঁকে তখন তার কাছ দিয়ে আলোকরশ্মি যাবার সময় তার পথ ও বেঁকে যাবে। ১৯১৯ সালে পূর্ণ সূর্য-গ্রহণের সময় সূর্যের ধার ঘেঁষে আসা তারার আলো পরীক্ষা করে এই বাঁকবার কথা জানা গেল। এ-রকম নিশ্চিত প্রমাণের পর আইনস্টাইনের মতবাদের বিরুদ্ধে বলবার আর কিছুই রইল না।

এই হল আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের বক্তব্যের ধারা। আইনস্টাইন এ সবই অঙ্কের সাহায্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন; গণিতের অল্প কয়েকটি পরিচ্ছন্ন অথচ অমোঘ সমীকরণের সাহায্যে তাঁর বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকে প্রকাশ করেছেন। আইনস্টাইন বলেছেন, তাঁর এই ব্যাখ্যাটি হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির সত্যিকার ব্যাখ্যা, কেননা কেবল এর সাহায্যেই আজকের দিন পর্যন্ত পরীক্ষালব্ধ সমস্ত তথ্যের মীমাংসা করা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, জনসাধারণ যতদিন উচ্চতর বিজ্ঞানের কলাকৌশল আর তার হাতিয়ার গণিতের সঙ্গে ব্যাপক পরিচয় লাভ না করবেন, ততদিন আপেক্ষিকতত্ত্বে পুরোপুরি বোঝায় ফাঁক থেকে যেতে বাধ্য। বিশ শতকের বিশের দশকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই আপেক্ষিকতত্ত্ব পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না, অথচ আজ দুনিয়ার প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই উঁচু শ্রেণীতে এই তত্ত্বের অন্তত মূল কথাগুলো শেখাবার ব্যবস্থা রয়েছে। আপেক্ষিকতত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে; শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আরো ব্যাপকভাবে বাড়বে। এভাবে ক্রমে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে পুরনো ধারণাগুলোকে বাতিল করে দিয়ে আমরা নতুন ধারণায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শিখব।

বলা প্রয়োজন, আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে তাঁর পরবর্তী অনেকে দুনিয়াটাকে আরো বেশি রহস্যময় করে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আইনস্টাইনের বরাবর লক্ষ্য ছিল দুনিয়া সম্বন্ধে মানুষের ধারণাকে সুষ্ঠু এবং পরিচ্ছন্ন করে তোলা, অস্পষ্ট বা ধোঁয়াটে করে দেওয়া নয়। তাই রহস্যবাদীদের এইসব দুর্জ্ঞেয়তার মতবাদ তিনি মোটেই সমর্থন করেন নি। বরং নিয়মের জগৎ সম্পর্কে আস্থা ঘোষণা করে তিনি বলেছেনঃ "একথা আমি কিছুতেই মানতে পারি নে যে, প্রকৃতিকে নিয়ে সৃষ্টিকর্তা অহেতুক এক দুর্জ্ঞেয় পাশা খেলায় মেতে আছেন।"

[১৩৬২/১৯৫৫]

বিজ্ঞানে উদ্ভাবন

ঝাঁকড়া-চুল উদাসীন স্বভাবের যে ছেলেটি অল্প বয়সে প্রেমের কবিতা লিখতে শুরু করে তার মতিগতিতে মুরুব্বিরা প্রায়শ শঙ্কা বোধ করলেও সমাজের আর পাঁচজন সচরাচর তাকে খানিকটা কৌতূহলমিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখেই দেখে থাকেন। তাচ্ছিল্য বা বিদ্রূপ যে কখনো একেবারেই জোটে না এমন নয়। কিন্তু কাব্যের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ থেকেই হোক, অথবা স্কুলের শিক্ষার মাহাত্ম্য-বঞ্চিত রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলামের কবিখ্যাতির প্রতি সম্মান দেখিয়েই হোক, এমনি তরুণ কবিদের প্রতি আমাদের এক ধরনের নীরব স্বীকৃতি এবং পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। তা না থাকলে এদেশের ঘরে ঘরে এত কবির জন্ম হত না। দুঃখের বিষয় বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধানের ব্যাপারে তরুণদের এমন সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া আমাদের সমাজে আজো প্রচলিত হয় নি। তাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাদের কাছে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ঢাকা।

আর পাঁচজনের মতো সাদামাটা আটপৌরে ভাষায় কথা বললে যেমন কবিতা হয় না, তেমনি আর সবার মতো সাদামাটা চোখে সব কিছু দেখলে বা গতানুগতিক পদ্ধতিতে চিন্তা করলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা যায় না। নানা নতুন নতুন ভাব নিয়ে—কখনো কখনো যা দুঃসাহসিকতার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে—ভাব প্রকাশের নতুন নতুন পদ্ধতি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা কবির কাজ। তেমনি বস্তুজগতের নানা সমস্যা, নানা ক্রিয়াপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিজ্ঞানমনা উদ্ভাবকের উপজীব্য।

আমাদের চারপাশে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে উদ্ভাবনার বীজ। কিন্তু তবু সবাই উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক হয় না। উদ্ভাবকের চিন্তা-ভাবনা কর্মপ্রচেষ্টা যেহেতু আর পাঁচজনের চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র, কিছুটা ভিন্ন খাতে, তাই সাধারণ মানুষ অন্তত প্রথমদিকে তাকে সন্দেহ ও সংশয়ের চোখে, হয়তো কিছুটা তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার চোখেও দেখে থাকে।

এ যে শুধু আমাদের দেশে ঘটে এমন নয়। যুগে যুগে সব দেশেই এমনি ঘটেছে। নতুন কথা যে বলেছে, প্রকৃতি বা সমাজের নতুন ব্যাখ্যা যে দিয়েছে, তারই ওপর মারমুখো হয়ে উঠেছে প্রচলিত সমাজ। গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস, ডারউইনের কথা আমরা জানি। তাঁদের উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক সত্য একদিনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। প্রচলিত ভাবধারার বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অবশেষে তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উদ্ভাবনশীলতার প্রতি যে সমাজ যত বেশি পরিমাণে সমর্থন, সহযোগিতা ও আনুকূল্য দেখিয়েছে সে সমাজই সভ্যতার দীপশিখাকে তত বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। প্রাচীন গ্রীস, মধ্যযুগের আরব বা আধুনিককালের পাশ্চাত্য দেশগুলো—সব ক্ষেত্রেই সভ্যতার অগ্রগতিতে উদ্ভাবক মানুষের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

যে সমাজে উদ্ভাবনার স্থান নেই, যেখানে প্রাচীন শাস্ত্রবচন বা প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরে যে কোন নতুন চিন্তা সামাজিক অনুশাসনের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়, আনুষ্ঠানিকভাবে ধিক্কৃত, সেখানে সভ্যতার অগ্রগতি প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র।

বলা বাহুল্য, জাতীয় অগ্রগতির জন্য জাতীয় চিন্তার ঐক্য প্রয়োজন। দেশের সব মানুষ যদি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চিন্তা করতে থাকেন তাহলেও সে দেশের অগ্রগতি হবে দুঃসাধ্য। তবে এই সমন্বিত সাধারণ জাতীয় আদর্শের অঙ্গীভূত হওয়া চাই উদ্ভাবনের প্রতি শ্রদ্ধা, তারুণ্যের প্রতি বিশ্বাস এবং নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি সহজ সহৃদয় আনুকূল্য।

কারো কারো মনে এমন ধারণা রয়েছে যে, আমাদের মতো উন্নয়নগামী দেশে উদ্ভাবনার প্রয়োজন কি? দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোতে এত আবিষ্কার হয়েছে, এত রকম পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সেগুলোর অনুকরণই তো আমাদের জন্য যথেষ্ট। এর চেয়ে ভুল ধারণা আর হতে পারে না। কেননা একথা যদি সত্যি হত তাহলে বিদেশী বই পড়লে বা বিদেশী কয়েকজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে আমাদের দেশের খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য সব সমস্যার সমাধান অতি অনায়াসে হয়ে যেত। কিন্তু খাদ্য-সমস্যার সমাধান তো শুধু সার আর বীজ আর পানি-সেচের ব্যাপার নয়। এধরনের সব কিছু কর্মকান্ডের মূলে রয়েছে মানুষ—তার দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মোদ্যম ও কুশলতা; সর্বোপরি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কার্যপদ্ধতি পরিবর্তন করার দক্ষতা। অর্থাৎ এক কথায় মানুষের উদ্ভাবন-ক্ষমতা। চিন্তাবর্জিত অনুকরণের সাধনা করে কখনো উদ্ভাবক হওয়া যায় না ; তার জন্য উদ্ভাবনের সাধনা প্রয়োজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনকুবেরের দেশ, যেখানে বড় বড় কোম্পানি হাজার হাজার গবেষক নিয়োগ করে রেখেছে তাদের মুনাফার স্বার্থে নতুন নতুন আবিষ্কার করার জন্য, সেখানেও দেখা যাচ্ছে অর্ধেকের বেশি আবিষ্কার হচ্ছে ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র আবিষ্কারকের প্রচেষ্টায়। মাত্র গত কয়েক দশকে এমনি বিচ্ছিন্ন উদ্ভাবকদের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হয়েছে হেলিকপ্টার (ইগর সিকর্স্কি), পোলারয়েড ক্যামেরা (এডুইন ল্যাণ্ড), জিরক্স্ এবং অন্যান্য কপিযন্ত্র, বলপয়েন্ট কলম, সেলোফেন, এয়ার-কণ্ডিশনার এবং এমনি আরো অনেক যন্ত্রপাতি। ধনকুবেরদের লক্ষ লক্ষ টাকার কারবারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসব নতুন উদ্ভাবিত যন্ত্রকে দাঁড়াতে হয়েছে।

কাব্যচর্চা আমাদের দেশে বহু দিন ধরে স্বীকৃত, অনুমোদিত। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি চর্চা এখনো সে স্বীকৃতি লাভ করে নি। কিন্তু সভ্যতার প্রচণ্ড প্রবাহে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে অংশ না নিয়ে আমাদের পক্ষে টিকে থাকার কোন উপায় নেই। আর তার জন্য প্রয়োজন খাপছাড়া স্বভাবের কবিকে আমরা যে স্বাধীনতা দিয়ে থাকি, বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধানীদের জন্য অন্তত তেমনি সামাজিক সহযোগিতা, সমর্থন ও আনুকূল্য।

[১৩৭৪/১৯৬৭]

বিজ্ঞান ও সমাজ

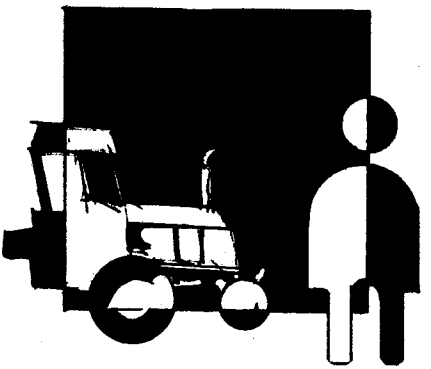

বিজ্ঞানের জাদুঘর

অবশেষে ঢাকায় বিজ্ঞানের জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। বিজ্ঞানের নানা বিচিত্র আবিষ্কার আর তার বিচিত্রতর প্রয়োগের চমকপ্রদ সম্ভার সেখানে সাজানো থাকবে। দেশের আজকের আর আগামী দিনের নাগরিকদের বিস্মিত দৃষ্টি আর কৌতূহলী মনের চাহিদা মেটাবার জন্য এমন একটি জাদুঘর বহু আগেই স্থাপিত হতে পারত। তবু দেরিতে হলেও এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সংবাদ নিঃসন্দেহে আনন্দের।

বিজ্ঞানের জাদুঘর কথাটার মধ্য যেন একটা শব্দগত দ্বন্দ্ব আর বৈপরীত্যের আভাস লুকানো আছে। বিজ্ঞানের বলতে আমরা বুঝি বস্তুনির্ভর পরীক্ষিত সত্য। কখনো কখনো হয়তো তা সাধারণের বোধের অতীত, গুটিকতক সাধক মানুষের বিচরণক্ষেত্র। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য প্রকৃতির অজানা রহস্যকে মানুষের সামনে অবারিত করা, দুর্জ্ঞেয়কে আনা মানুষের বুদ্ধির গোচরে, চারপাশের প্রকৃতির নানা বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের জটিলতা ভেদ করে তাকে করা মানুষের বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তার সাধারণ জীবনের অঙ্গীভূত।

অথচ জাদু কথাটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইন্দ্রজাল আর ভোজবাজি, অলৌকিক অশরীরী মায়াবী ক্রিয়াকাণ্ড কিংবা চমক লাগানো ভেলকির খেলা, বস্তুর অতীত রহস্যনির্ভরতা—অর্থাৎ বিজ্ঞানের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশ। অবশ্য অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের মনে যে প্রাথমিক চমক সৃষ্টি করে তা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু সেই চমকটাকেই প্রধান অবলম্বন করা, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের মনকে রহস্যমুক্ত করার পরিবর্তে রহস্যের আবর্তে সম্মোহিত করার চেষ্টা বিজ্ঞানের ব্যাভিচারের নামান্তর।

বিজ্ঞানের জাদুঘরে মানুষকে সত্যি সত্যি এমনি এক জাদুকরী আবহাওয়ায় বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হবে এমন ইঙ্গিত করা মোটেই আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং সোনাজাদু, জাদুমানিক অর্থাৎ অতি মূল্যবান প্রিয়বস্তু—জাদু শব্দের এই অর্থে বিজ্ঞানের জাদুঘরকে নানা বৈজ্ঞানিক প্রিয়বস্তুর মূল্যবান সংগ্রহশালা হিসেবে ধরলে শব্দগত বৈপরীত্যের গোলকধাঁধা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

শব্দার্থের এই প্রসঙ্গটি আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও বিজ্ঞানের জাদুঘরের ক্ষেত্রে এর বিশেষ একটি তাৎপর্য রয়েছে। বিজ্ঞানের জাদুঘরে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়ের নানা প্রয়োগমূলক বিষয়বস্তু প্রদর্শনের

আয়োজন থাকবে তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু পরিবেশনের ধরন, বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও বিন্যাস অনেকখানিই নির্ভর করবে এ প্রদর্শনের কি উদ্দেশ্য তার ওপরে।

স্বভাবতই বিশেষ সতর্ক না হলে চমক লাগাবার প্রলোভনটা প্রাথমিক হয়ে দেখা দিতে পারে। কেননা অন্যকে চমকিত করে ঠকিয়ে দেবার মধ্যে একটা সর্বজনীন আনন্দ আছে। এই আনন্দ যে ম্যাজিসিয়ানদেরই একচেটিয়া তা নয়, আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সময়ে অন্যের ওপর টেক্কা দিয়ে এধরনের আনন্দলাভের প্রয়াস পেয়ে থাকি। আজকাল কোন স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলে তাতে আশাতীত দর্শক সমাগম ঘটে। এধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন উদ্যম হিসেবে অতি মহৎ এবং সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, প্রদর্শনীতে সাধারণত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাদের নবলব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে সাধারণ মানুষকে তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে। তরুণ শিক্ষার্থীদের এই প্রবণতা অতি স্বাভাবিক এবং এথেকে তারা যে তৃপ্তি পায় তারও একটা শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের জাদুঘরেও কি এধরনের কিশোরসুলভ তৃপ্তি অর্জনের প্রয়োজন দেখা দেবে?

প্রশ্নটাকে অন্যভাবে একটু ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, আজকের দিনে আমাদের চতুর্দিকে বিজ্ঞানের নানা উদ্ভাবনার বিচিত্র প্রয়োগে সাধারণ মানুষ কি ইতোমধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে চমকিত, বিমুগ্ধ এবং অনেকাংশে বিভ্রান্ত নয়? বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রাথমিক যুগে—যখন বিজ্ঞানের অসংখ্য চমকপ্রদ আবিষ্কার আজকের মতো দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে নি—এমন কি উনিশ শতকেও মানুষকে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট ও সম্ভ্রমশীল করার জন্য যেসব চমকপ্রদ পরীক্ষা দেখাবার প্রয়োজন অনুভূত হত, আজও কি সে প্রয়োজন রয়েছে? না কি আজকের দিনের প্রাথমিক প্রয়োজন হল অহরহ মানুষ যেসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলভোগী অথচ তার পুরোপুরি মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত ও পীড়িত বোধ করে সে সব সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি দূর করা, বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে স্বাভাবিক জীবনযাপনের উপযোগী করে তাদের চিত্তের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা?

বলাই বাহুল্য, এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আগের দিনের চেয়ে আজ অনেক বেশি তীব্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রাথমিক যুগে শিক্ষিত মানুষের পক্ষে সর্বাঙ্গীন মানুষ হওয়া তেমন দুঃসাধ্য ছিল না। ওমর খৈয়াম হতে পেরেছিলেন একাধারে প্রতিভাধর কবি, বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ। লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি ছিলেন যুগস্রষ্টা শিল্পী, বিজ্ঞানী, যন্ত্রকুশলী। কিন্তু আজ প্রতিনিয়ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এমন প্রচণ্ড ব্যাপ্তি ঘটছে যে, সাধারণ শিক্ষিত মানুষের পক্ষে তো বটেই, অতি গুণিজনের পক্ষেও বিজ্ঞানের নানা বিভাগের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা হয়ে পড়ছে অত্যন্ত কঠিন।

এই পরিস্থিতির এক অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে একদিকে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার আর চিন্তাধারা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জ্ঞান আর উপলব্ধির মধ্যে দুস্তর দূরত্ব ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। অথচ সুষ্ঠু সুসমঞ্জস গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের তাগিদে এই দূরত্বকে অতিক্রম করা প্রয়োজন। প্রকৃতির রহস্য-সন্ধানী বিজ্ঞানীকে এগিয়ে

আসতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে, সর্বজনগ্রাহ্য ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে হবে তার আবিষ্কারের মর্মকথা আর তাৎপর্য; কেননা সাধারণ মানুষের, সমাজের সমর্থন ছাড়া বিজ্ঞানীর সাধনা হবে আড়ষ্ট। আবার তেমনি সাধারণ মানুষকে তার নিজেরই স্বার্থে ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসতে হবে বিজ্ঞানীর কাছে। উপলব্ধি করতে হবে বর্তমান যুগের চালিকাশক্তি যে-বিজ্ঞান তার মর্মকথা, আর সেই জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে সমাজ জীবনকে মানুষের আয়ত্ত বস্তু ও মননের বিচিত্র ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করার কাজে।

আশার কথা এই যে, একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রাচুর্য ও জটিলতা বেড়েছে তেমনি বিজ্ঞানেরই আবিষ্কারের কল্যাণে ভাবপ্রকাশের মাধ্যমেও আজ বিপুল উন্নতি ঘটেছে এবং ঘটছে।

বিজ্ঞানের জাদুঘরের প্রসঙ্গটিতেই আবার ফিরে আসা যাক। পৃথিবীর সব উন্নত দেশেই আজ বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি এবং বোধগম্য করার জন্য বিজ্ঞানের জাদুঘরে নানা বিচিত্র পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে। মস্কো নগরীর অতি বিশাল একজিবিশন অব ইকনমিক অ্যাচিভ্‌মেন্টস-এ বিদ্যুৎশক্তি, পরমাণুশক্তি, রকেট ও মহাকাশ অভিযান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের পৃথক পৃথক প্রাসাদে শুধু যে অতি সাম্প্রতিক আবিষ্কারের নানা বিচিত্র দর্শনীয় বস্তু রাখা হয়েছে তাই নয়, সে সব বিষয়ে ছায়াছবি দেখানো এবং বিনামূল্যে সচিত্র পুস্তিকা সরবরাহেরও ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিদিন নানা বয়সের হাজার হাজার নরনারী এগুলো দেখছে এবং দু'হাত ভরে বহু বিচিত্র জ্ঞান আহরণ করছে।

এক সময় শিকাগো শহরের বিখ্যাত মিউজিয়াম অব সায়েন্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির অতি কাছাকাছি বাস করার ফলে বহুবার সেখানে যাবার সুযোগ হয়েছিল। জাদুঘরটি এমন বিশাল যে, এর হাজার হাজার দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে রয়েছে মাটির তলায় একটি কয়লা খনির কার্যরত মডেল আর গত মহাযুদ্ধে বন্দী একটি আস্ত জার্মান সাবমেরিন। পাঁচ-ছ' বছর পর সম্প্রতি আবার শিকাগোর এই জাদুঘরটিতে গিয়ে এর অনেকগুলো বিভাগ চিনতে রীতিমতো কষ্ট হল। এসব বিভাগের এত পরিবর্তন ঘটেছে যে, পাঁচ-ছ' বছর আগের সঙ্গে তার প্রায় কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না! প্রসঙ্গত পরমাণু-শক্তি, টেলিযোগাযোগ, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বিভাগের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে বিষয়বস্তুকে আরো সহজবোধ্য, আধুনিক ও অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করার জন্য ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে।

শিকাগোর এই জাদুঘরেও নিয়মিত নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ওপর বক্তৃতা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা শিল্পগোষ্ঠী এর নানা অংশের প্রদর্শনীর দায়িত্ব নিয়ে থাকে। যেমন টেলিফোনশিল্প, রাবারশিল্প, মোটরশিল্প, এরোপ্লেনশিল্প, কৃষিযন্ত্রপাতিশিল্প, বনজশিল্প, খনিজ তেলশিল্প ইত্যাদি। সম্ভবত আমাদের দেশেও বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীকে এভাবে আগ্রহান্বিত করে তোলা যায়—যেমন পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, সিমেন্টশিল্প, নানা

ধরনের রাসায়নিক শিল্প, বিদ্যুৎশিল্প, রেলযোগাযোগ বিভাগ, টেলিফোন বিভাগ, মৎস্য বিভাগ ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারটি স্বভাবতই রীতিমতো জটিল। এবিষয়ে কথা উঠতে পারে যে, আমাদের দেশ এখনো পাশ্চাত্যের মতো উন্নত হয়ে ওঠে নি, কাজেই আমাদের দেশে বিজ্ঞানের জাদুঘরে জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা না করে বা অতি আধুনিক নানা ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা না করে মোটামুটি অতি সাধারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত হবে। কথাটা একদিক থেকে যুক্তিসঙ্গত মনে হবে। আবার অন্য দিক দিয়ে কথাটা অর্থহীনও বটে।

আমাদের সাধারণ মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মান নিচুস্তরের তা ঠিক। সাধারণভাবে এদেশের সমাজ বিজ্ঞান বা শিল্পকৌশলের প্রয়োগের দিক থেকে হয়তো পাশ্চাত্যের উন্নত দেশের তুলনায় পঞ্চাশ বা একশ বছর পিছিয়ে আছে। কিন্তু সেজন্য আমাদের দেশের মানুষকে শুধু স্টীম ইঞ্জিনের রহস্য বোঝালেই যথেষ্ট হবে, আপাতত জেট-ইঞ্জিনের রহস্য না বোঝালেও চলবে, এধরনের কল্পনার যুক্তি খুঁজে পাওয়া ভার। আমরা একই সঙ্গে গরুর গাড়িও ব্যবহার করি, আবার অতি আধুনিক জেটপ্লেনও ব্যবহার করি। ছায়াছবি, টেলিভিশন, ট্রানজিস্টর বা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রভৃতি সাম্প্রতিক আবিষ্কারকে আমাদের মতো অনুন্নত দেশে ব্যবহার করতে কেউ আপত্তি তুলছেন বলে শোনা যায় নি।

বিজ্ঞানের মানদণ্ড আন্তর্জাতিক ও সর্বজনীন। আমাদের দেশের অতি মফঃস্বলের যে মানুষটি গরুর গাড়ি বা নৌকা ছাড়া আধুনিক কোন উপায়ে যাতায়াতের সুবিধে ভোগ করতে পারে না সেও বিনা দ্বিধায় আধুনিক ট্রানজিস্টর রেডিও ব্যবহার করে। আমরা যদি মানুষকে শুধু প্রাচীন আবিষ্কার টেলিস্কোপ বা টেলিগ্রাফের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখি আর তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রজননগত ক্ষতিকর প্রভাব বা কৃত্রিম রেশমের রহস্য সম্বন্ধে রাখি অজ্ঞ, তাহলে খুব সম্ভব ইতিহাস আমাদের পশ্চাদ্দৃষ্টির নির্বুদ্ধিতাকে ক্ষমা করবে না।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের জাদুঘরের লক্ষ্য তো শুধু সমাজের প্রাচীনপন্থী নিরক্ষর প্রবীণগোষ্ঠী নয়। তার একটি প্রধান এবং অতিপ্রত্যাশিত দর্শকদল হবে আগামী দিনের নাগরিক আমাদের উঠতি তরুণ সমাজ ঃ যারা উৎসুক, বিজ্ঞানমনা, উদ্যমশীল; যাদের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞানে, যন্ত্রকৌশলে, চিকিৎসাশাস্ত্রে বাইরের জগতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন কীর্তি স্থাপনের স্বপ্ন দেখে।

উন্নত দেশগুলোতে বিজ্ঞানের জাদুঘরে দর্শনীয় বস্তু সমাবেশের সময় এই বিজ্ঞানমুখী কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণীদের কথা সকলের আগে মনে রাখা হয়। তারুণ্যের বড় লক্ষণ হল কৌতূহল আর কর্মচাঞ্চল্য, হাতেকলমে সব কিছু পরখ করে দেখার তীব্র বাসনা। একথাটি মনে রেখে অধিকাংশ দর্শনীয় বস্তুতে এমন ব্যবস্থা করা

থাকে যেন জিনিসটি নষ্ট না করেও দর্শকরা হাতে-কলমে চালিয়ে তার কার্যকারিতা বা কার্যগত কৌশলটি উপলব্ধি করতে পারে। আমেরিকার বোস্টন শহরে শুধু ছোটদের জন্যই একটি জাদুঘর রয়েছে। তাঁরা সেখানে বৈজ্ঞানিক বিষয়কে ছোটদের মনোরঞ্জক ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য যে কত অসংখ্য রকমের খেলা এবং শিক্ষামূলক কর্মপন্থা সারা বছর ধরে চালু রেখেছেন তার কথা বলে শেষ করা যাবে না।

অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় আমরা পাশ্চাত্যের সঙ্গে সমান তাল রাখতে পারি নি তার একটি বড় কারণ প্রবল প্রতাপশালী বিদেশী শক্তি অতীতে আমাদের সে সুযোগ দেয় নি। বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতায় আমাদের তরুণ সমাজ যাতে আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে সে সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞানের জাদুঘর হোক আমাদের হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

[১৩৭৪/১৯৬৭]

বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও যান্ত্রিকতা

বর্তমান সভ্যতায় যান্ত্রিকতার প্রভাব নিয়ে চিন্তিত আজ অনেকেই। মানুষ যেন দিন দিন হয়ে পড়ছে যন্ত্রের দাস। যন্ত্রের দাবীতে মানুষের স্বাধীনতা হচ্ছে সঙ্কুচিত। মানুষের ব্যবহারেও যেন ছাপ পড়ছে যন্ত্রের শীতল নিস্পৃহতার। এই যন্ত্র সভ্যতা কি সত্যি একদিন মানুষের মনুষত্বকে গ্রাস করবে?—ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

প্রথমেই বলতে হয় 'যান্ত্রিকতা' কথাটার মধ্যেই যেন একটা পক্ষপাতের আভাস আছে। এপ্রসঙ্গে কথা উঠলেই আমরা সচরচর ধরে নিই যেন এটা একটা অপরিচ্ছন্ন, অশুচি বিষয়। ব্যাপারটা আমাদের জীবনে না থাকলেই ভাল হত; কিন্তু এসে যখন পড়েছে তখন কি আর করা, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আমরা সযত্নে যান্ত্রিকতার প্রভাব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি।

আদতে আমরা—অর্থাৎ আমাদের দেশে অনেকেই—যন্ত্রের বিরুদ্ধে। যন্ত্রের প্রতি বিতৃষ্ণা যেন আমাদের সহজাত। আমরা 'যন্ত্রের বিরুদ্ধে' একথা বললেই বলতে হয় তাহলে আমরা কার পক্ষে? যন্ত্রের বিরুদ্ধতা যাঁরা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করবেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বলবেন তাঁরা প্রকৃতির পক্ষে। তাঁদের যুক্তির অভাব নেই। প্রকৃতির অনুসারী হবার স্বপক্ষে এধরনের যুক্তি অতি সহজেই দেয়া যেতে পারেঃ

'আমরা প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের নাড়ির সম্পর্ক। যা কিছু প্রাকৃতিক তাই পবিত্র আর বিশুদ্ধ। প্রকৃতি থেকেই সব কিছুর জন্ম। কাজেই প্রকৃতি হল আদি আর অকৃত্রিম। সুতরাং যা কিছু প্রকৃতির ব্যতিক্রম তাই কৃত্রিম আর কলুষিত।

'যন্ত্র হল প্রকৃতির ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম শুধু নয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধতা। অতএব যন্ত্র কৃত্রিম আর কলুষিত। আর একই কারণে যন্ত্র থেকে উদ্ভূত যে দৃষ্টিভঙ্গি, যন্ত্রসহযোগী যে মনোভাব, তাও প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম-বিরুদ্ধ বলে পরিত্যাজ্য।'

এছাড়া এই মতামতের সমর্থকদের দৃষ্টিতে মানুষ বিবেকবান, যন্ত্র বিবেকহীন। মানুষ সৃজনশক্তির অধিকারী, যন্ত্র সৃজনশক্তিশূন্য। মানুষ মানবিক নানা সদগুণের অধিকারী। নানা সুকুমার বৃত্তি মানুষের হৃদয়ে আন্দোলিত। দুর্ভাগ্যক্রমে যন্ত্রের হৃদয় নেই, কাজেই তার হৃদয়বৃত্তি বা মানবিক সদগুণ থাকার প্রশ্ন ওঠে না। তাহলে

স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারেঃ এই নিষ্প্রাণ বিবেকহীন যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা কি মানুষের সৃজনশীল জীবনযাপনের পরিপন্থী নয়?

যাঁরা এই মতের প্রবক্তা তাঁরা হয়তো সম্ভব হলে যন্ত্রবিহীন আদিম প্রাকৃতিক সমাজে বাস করতে পারলেই সুখী হতেন। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো শহর নগর ছেড়ে বনবাসে যাবার প্রয়োজন হলে মোটেই বিমর্ষ হবেন না। সেকালে গাছে গাছে পাখি পরম সুখে গান গাইত, নদীতে সুপেয় পানির ধারা বেয়ে যেত, বনে-জঙ্গলে সুস্বাদু ফলের কোন অভাব ছিল না। অবসরকালে প্রকৃতির বিচিত্র শোভা দেখে, বিশ্বরহস্যের নানা তত্ত্ব চিন্তা করে গভীর প্রশান্তিতে মানুষের দিন কাটত। আফসোসের বিষয়, এমনি কল্পলোক যদি কোনকালে থেকেও থাকে—সেকালের সেই শান্তস্নিগ্ধ কালজয়ী প্রশান্তি বর্তমান নাগরিক সভ্যতার যান্ত্রিক জীবনে আশা করা বৃথা। যাঁরা সে প্রত্যাশা করেন তাঁরা এক স্বপ্নের কল্পরাজ্যে বাস করছেন।

আসলে এই যন্ত্রবিরোধিতা আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতারই একটি প্রতিফলন। বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের ক্ষেত্রে অতীতে আমাদের যে কৃতিত্ব বা অবদানই থাকুক, মধ্যযুগে পাশ্চাত্যের দেশগুলো এক্ষেত্রে আমাদের ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে; তারপর থেকে গত তিন-চার শতাব্দী ধরে রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে শোচনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তার হাত থেকে অন্তত কল্পনার জগতে পরিত্রাণ পাবার আশায় আমরা এক যন্ত্রবিরোধী মনোভাবকে আঁকড়ে ধরেছি।

শুধু তাই নয়। যন্ত্র ন্যক্কারজনক, বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা পবিত্র। বৈষয়িক সমৃদ্ধি কলুষময়, আধ্যাত্মিক মুক্তিই মানুষের পরম কাম্য। প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে যন্ত্রকৌশলের সাধনার মধ্যে রয়েছে অমঙ্গলের বীজ, প্রকৃতির রুদ্র রোষ আর তার অমোঘ বিধানকে স্বীকার করাতেই হৃদয়ের প্রশান্তি।—এমনি সব নানা ধারণা আমাদের বিজ্ঞানবিমুখতার প্রতীক।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, মধ্যযুগের আগে মানুষের জীবন যাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য আনার জন্য যে সব যন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে সেগুলোর প্রতি কারো তেমন বিতৃষ্ণা দেখতে পাওয়া যায় না। যেমন কৃষি কাজে ব্যবহৃত লাঙ্গল। চাষাবাদে ব্যবহারের জন্য লাঙ্গল একটি অপরিহার্য যন্ত্র তাতে সন্দেহ নেই। লাঙ্গলের ব্যবহারের মধ্যে প্রকৃতি - বিরুদ্ধতার অপবাদ সম্ভবত কেউ দেবেন না। কিন্তু কলের লাঙ্গল আধুনিক আবিষ্কার বলে তার ব্যবহার সন্দেহভাজন। তেমনি নৌকা নদীপথে যাতায়াতের জন্য একটি যন্ত্র। পালের সাহায্যে কৌশলে বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নৌকায় একদেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া যায়। নৌকার ব্যবহারে দোষের কিছু নেই। কিন্তু যন্ত্রচালিত জাহাজ বা উড়োজাহাজের বেলায় ভিন্ন কথা। কিংবা ধরা যাক তীর-ধনুক-তলোয়ারের কথা। যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য তলোয়ার যন্ত্রটি ব্যবহৃত হচ্ছে বহু শতাব্দী ধরে।

তার মধ্যে যান্ত্রিকতার বিষবাষ্প কেউ আবিষ্কার করতে পারবে না। কিন্তু একই কাজে অধিকতর দক্ষ বন্দুক, ট্যাঙ্ক, রেডার ইত্যাদি মূর্তিমান যান্ত্রিকতার প্রতিভূ হিসেবে আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

তাহলে যন্ত্র বা যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধতা করে আমরা কি আধুনিক সভ্যতা আর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকেই অস্বীকার করতে চাচ্ছি? খুব সম্ভব খোলাখুলি এমন কথা কেউ বলবেন না। কিন্তু তা না হলে প্রাচীন যন্ত্র গ্রহণযোগ্য, অথচ আধুনিক যন্ত্র বা এই যন্ত্রসহযোগী মনোভাব অগ্রাহ্য কি করে হতে পার?

যন্ত্রসহযোগী মনোভাব বলতে আমরা কি বোঝাই তার দু'একটি উদাহরণ দিই। ধরুন, ঘড়ির কাঁটা ধরে নির্দিষ্ট সময়ে কারখানার বাঁশি বেজে উঠল। কাতারে কাতারে মজুররা ছুটল কারখানায়, কাজ শুরু হল। চিমনিতে ধোঁয়া উড়িয়ে কারখানায় যন্ত্র চলল। যতক্ষণ সে যন্ত্র চলতে থাকবে কাজ বন্ধ রেখে গল্পগুজব করা চলবে না। যন্ত্রের বিরুদ্ধবাদী বলে উঠবেনঃ এই দেখুন, আপনার হয়তো ইচ্ছে আজকে ঘন্টাখানেক পরে কাজ শুরু করবেন, কিন্তু তার উপায় নেই, যন্ত্র বসে থাকবে না। অথবা আপনার ইচ্ছে করছে কাজ বন্ধ রেখে বাড়ি যাই, তাও হবে না। আপনি হয়ে পড়েছেন একটি ইচ্ছাশক্তিহীন যন্ত্রদাস।

তাহলে কি আমরা বলব, সময়নিষ্ঠা, নির্দিষ্ট সময়ে সমন্বিতভাবে কাজ করা, কাজে একাগ্র নিবিষ্টতা এগুলো সবই যান্ত্রিকতার লক্ষণ, অতএব বর্জনীয়? হয়তো আপনি বলবেন, জ্বী না, এগুলো সবই গ্রহণযোগ্য আদর্শ। তবে যন্ত্র মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করছে, সেখানেই আপত্তি। এখানে প্রশ্ন হল, যেকালে আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না সেকালে কি নিয়মনিষ্ঠার মর্যাদা দেওয়া হত না? সেকালে পরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর যথেচ্ছ আচরণ কি সব সময়েই সামাজিক কল্যাণের পরিপোষক বলে গণ্য করা হত?

অবশ্য এটা ঠিক, প্রাচীনকালের তুলনায় আজ সমাজ সংগঠন অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। সেকালের অপেক্ষাকৃত সরল সমাজে অনেক কাজ লোকে একা একাই করতে পারত। কিন্তু আজকের জটিল সংগঠিত সমাজে একের কাজের সঙ্গে অন্যের কাজের সম্পর্ক বেড়েছে। কাজেই সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে যেমন যন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তেমনি সমাজের শ্রমবিভাগের স্বার্থে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছে। সমাজের স্বার্থে যন্ত্রের উদ্ভব, সামাজিক প্রয়োজনেই আধুনিক জীবনে দ্রুততর ছন্দের সৃষ্টি।

ট্রেনে চড়ে দূরের পথে যাবার সুবিধে যদি ভোগ করতে চাই তাহলে ট্রেন ছাড়বার নির্দিষ্ট সময়ে স্টেশনে হাজির হতেই হবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার 'মহৎ আদর্শে' অনুপ্রাণিত হয়ে যদি ঘন্টাখানেক পরে এসে হাজির হই আর ট্রেনের যান্ত্রিক সময়নিষ্ঠার

বিবেকবিহীন নিষ্ঠুরতার নিন্দাবাদ করি, তাহলে তা আর যাই হোক বর্তমান যুগের সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সুসমঞ্জস হবে না।

কেউ কেউ বলবেন, আচ্ছা, না হয় মানলাম, যন্ত্র আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছে। যন্ত্রের সাহায্যে আমরা আধুনিক সভ্যতার নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছি, জীবনকে নানা দিকে দিয়ে বৈচিত্র্যময় করে তুলছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের পীড়নে মানুষের জীবন যে হৃদয়হীন হয়ে যাচ্ছে, কল-কারখানার যান্ত্রিক জীবনের একঘেঁয়েমি আর বিরামহীন ক্লান্তিতে শ্রমজীবী মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে নীরস আর নির্জীব, তার কি হবে?

এর জবাবে বলতে হয়, যন্ত্রের প্রয়োজন মানুষের জীবনে যে চাপ সৃষ্টি করছে, একটানা একঘেঁয়ে শ্রমে মানুষের দেহ আর মন হচ্ছে পিষ্ট তার জন্য যন্ত্রের প্রয়োগ যতখানি দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী যন্ত্রের প্রয়োগ যে করে সেই মানুষ; আর যন্ত্রের ব্যবহারকারী মানুষের অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের ইচ্ছা। এক কথায় সমাজের শোষণমূলক ভিত্তি। যন্ত্র তো নিজে নিরপেক্ষ—তার যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোনরকম মনোভাবই নেই। যন্ত্রের প্রকৃষ্ট বা অপ্রকৃষ্ট ব্যবহারের জন্য মানুষ এবং তার সমাজই দায়ী। সমাজের কাঠামো যদি বদলানো যায়, সমাজ থেকে শোষণের ভিত যদি ওপড়ানো যায় তাহলে যন্ত্রের ব্যবহার হতে পারে মানবিক মূল্যবোধে দীপ্ত, মানুষের সৃজনশীল কর্মপ্রচেষ্টা উজ্জীবনের স্বার্থে। কাজেই যান্ত্রিকতার ভিত্তি রয়েছে সমাজ-সংগঠনের মধ্যে, তার সংশোধনও প্রয়োজন সেখানেই; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সেজন্য দোষী করে লাভ নেই।

হয়তো আগামী দিনে সভ্যতার আরো অগ্রগতির ফলে বৈজ্ঞানিক প্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা নতুন সমাজ-সংগঠন গড়ে তুলতে পারব। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আসবে পরিবর্তন; আর সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যন্ত্রের সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে। সেদিন যান্ত্রিক সভ্যতায় বাস করেও মানুষের সৃজনশীলতা হবে না ব্যাহত, যন্ত্রের দাবীতে মানুষের জীবন হবে না পীড়িত, আর যান্ত্রিকতার যে সমস্যা নিয়ে আমরা আজ চিন্তিত তারও থাকবে না অস্তিত্ব।

[১৩৭৪/১৯৬৭]

এ-যুগের জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ প্রান্তে ১৯৪৫ সালে এক বিপুল নরমেধযজ্ঞের মধ্য দিয়ে হল বিজ্ঞানের নবতম যুগের প্রতিষ্ঠা; প্রকৃতির অন্তরতম লোকে যে অপরিমেয় শক্তির উৎস—মানুষ তার ওপর নিজের আধিপত্যের উদ্বোধন করল ধ্বংস আর রক্তের স্রোতে অবগাহন করে। মানব সভ্যতার সমগ্র ইতিহাসে অদৃষ্টের এত বড় পরিহাসের নজির সম্ভবত আর পাওয়া যাবে না।

ইতিহাসের সেই আদিযুগে মানুষ একদিন ছিল প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক—নির্বোধ, অসহায়। বন্য পশুর সঙ্গে তার তফাত ছিল সামান্য। তারপর ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির জোরে প্রকৃতির নানা শক্তিসম্ভারকে আপন প্রয়োজনে নিয়োজিত করে সে তার নিজের জীবনকে করে তুলেছে সুস্থ, সুন্দর, আনন্দময়। আগুন আর ধাতুর ব্যবহার নিঃসন্দেহে প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন করেছে; প্রকৃতির দয়ার ওপর নির্ভর করে না থেকে নিজের চেষ্টায় কৃষিকাজের আয়োজন ব্যাপক সামাজিক উৎপাদনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

তবু হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের শক্তি উৎপাদনের হাতিয়ার থেকেছে নিতান্তই সীমাবদ্ধ। মাত্র গত দু'শ বছরে বিজ্ঞানের সাধনায় মানুষের প্রতিভার আশ্চর্য বিকাশ ঘটেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে পর পর ঘটেছে বাষ্প, তেল আর বিদ্যুৎশক্তির যুগান্তকারী আবিষ্কার, হয়েছে সমগ্র আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন। আর তাই এই গত দু'শ বছরে মানুষের জীবনযাত্রা পদ্ধতির যে পরিবর্তন, সভ্যতার যে অগ্রগতি ঘটেছে, তার আগের দু'হাজার বছরেও তা হয় নি। বাষ্প, তেল আর বিদ্যুৎশক্তিঃ বিজ্ঞানের নানা নতুন নতুন আবিষ্কারের সাহায্যে মানুষ যেন সমস্ত পৃথিবীকে তার হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে। বিস্ময়কর দ্রুতগামী যানবাহন, আশ্চর্য নানা রোগনিরাময় ব্যবস্থা, উন্নত নগর-পরিকল্পনা, অপরিমেয় যান্ত্রিক উৎপাদন—স্বচ্ছন্দ, সুখী জীবনের অজস্র আয়োজন এই বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মানব সভ্যতাকে এক অতুলনীয় গৌরবে মণ্ডিত করেছে।

অথচ এসবের পরেও বিজ্ঞানীরা বলছেন, পরমাণু-শক্তির আবিষ্কারের ফলে এমন এক নতুন ধরনের অপরিমেয় শক্তি মানুষের হাতে এল যার তুলনায় এর আগের সব রকম শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা নিতান্ত তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হবে। পরমাণু-শক্তি একদিন মানুষকে প্রকৃতির অন্ধ দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি এনে দেবে—মানুষের জীবনকে শক্তি ও প্রাচুর্যের অবারিত ধারায় অভিষিক্ত করে তুলবে।

কিন্তু অদৃষ্টের কী নিদারুণ পরিহাস! এই পরমাণু-শক্তির সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটল জীবন ও প্রাচুর্যের বার্তাবহ হিসেবে নয়, মৃত্যু আর ধ্বংসের দূত হিসেবে। গত দশ বছরে পরমাণু যুগের ভয়াবহতা বেড়েছে বই কমে নিঃ ইউরেনিয়াম-বোমা থেকে হাইড্রোজেন-বোমায় পারমাণবিক যুদ্ধের ভ্রূকুটি কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছে।

কলহাস্যে ঘর মুখরিত করার পরিবর্তে নবজাত শিশু যদি নখদন্ত বিস্তার করে আসে তাহলে সে শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলের মনে যে গভীর আশঙ্কার কারণ ঘটবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরমাণু-যুগের আবির্ভাবও আজ তেমনি মানুষের সামনে নানা অভাবিতপূর্ব সমস্যা এনে দাঁড় করিয়েছে। আজকের সভ্যতা ও বিজ্ঞান তার সৃজনশীলতার শ্রেষ্ঠতম অবদান হিসেবে যে নতুন শিশুর জন্ম দিয়েছে তার ভবিষ্যৎ কী হবে? —এ প্রশ্ন আজ সারা দুনিয়ার মানুষের মনকে আলোড়িত করছে।

দুনিয়ার সেরা মনীষী আর চিন্তাবিদদের সামনে আজ সবচেয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে যে সমস্যা সে হল পারমাণবিক যুগের সমস্যা। কেননা, এই সমস্যার সমাধানের ওপরেই নির্ভর করছে এক কথায় মানুষের সব কিছু—তার হাজার হাজার বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐশ্বর্যসম্পদ, সমগ্র মানব সভ্যতার হৃদস্পন্দন। বিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার পরমাণু-শক্তিকে ধ্বংসের আয়োজনে লাগানো হলে হয়তো দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাবে মানুষের অস্তিত্বটুকুও।

এই বিপর্যয়কর অবস্থার মুখে দাঁড়িয়ে আজ এক ধরনের বিমূঢ় চিন্তার উদ্ভব হয়েছে যার মর্ম হলঃ অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তির কোন পথ নেই; আর এই সমাধানবিহীন সঙ্কট সৃষ্টির জন্য আসলে তো বিজ্ঞানীরাই দায়ী! বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলেই মারাণায়োজনের আজ এত উন্নতি, মানুষের জীবনে এত অনিশ্চয়তা, অজস্র সমস্যা আর সঙ্কটে জীবন কন্টকাকীর্ণ।

অর্থাৎ আসলে সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেয়ে দোষটা সরাসরি বিজ্ঞানের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা। একদল বলছেনঃ বিজ্ঞানীরা আশ্বাস দিয়েছিলেন, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আহার ও আবাসের সমস্যা ঘুচবে, রোগ-মারীর হাত থেকে নিষ্কৃতি ঘটবে, জীবনে আনন্দ-প্রাচুর্য-শান্তি আসবে। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই বিংশ শতাব্দীতেও বহু কোটি মানুষের জীবনে সে-সব কিছুই আসে নি। বরং দুনিয়ার এক অংশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি অনুন্নত দেশের মানুষের জীবনমানে এনেছে আরো অধোগতি, ব্যাপক সামাজিক সংকট, আর—সবচেয়ে মারাত্মক যা—সর্বধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা। তাহলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি আশীর্বাদের চেয়ে কি অকল্যাণই বেশি ডেকে আনে নি?

এ এক আশ্চর্য জিজ্ঞাসা! এক আশ্চর্য প্রহেলিকাও বটে!

খুব সহজ করে বললে বলা যায়, আঠার এবং উনিশ শতকে ইউরোপে শিল্পসভ্যতার সেই প্রথম উন্মেষের যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের জীবনের চতুর্দিকে যে অপ্রতিহত বিকাশ, আশা ও আনন্দের বাণী বয়ে এনেছিল, বিশ শতকের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আজ তার ওপর সন্দেহ দৃঢ়মূল হয়ে উঠছে; প্রশ্ন জেগেছে, সে আশা আর আশ্বাসের কতখানি পূরণ হল?

চতুর্দিকে অপ্রতিহত অগ্রগতির সে আশ্বাস যে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় নি সে-বিষয়ে আজ আর দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। এটা আজ দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, এযাবৎ বিজ্ঞানের যে বিকাশ হয়েছে তা হয়েছে প্রধানত সীমাবদ্ধ পরিসরে এবং দুনিয়ার বৃহত্তর অংশের মানুষ তার অবদান থেকে বঞ্চিত থেকেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, যেসব দেশে বিজ্ঞানের বহুমুখী প্রসার ঘটেছে সেখানেও পারমাণবিক যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের কল্যাণকর দিককে আজ অর্থহীন, তুচ্ছ মনে হচ্ছে। সমস্যার মূল কারণ যাই হোক, বিজ্ঞানীদের মধ্যেও একটা অংশ যে এর সামনে বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন সেটা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে। তাই একদিকে বিজ্ঞানীদের কোন কোন মুখপাত্র খোলাখুলিই স্বীকার করছেনঃ এযুগের বহু সমস্যার জন্য মনে হয় বিজ্ঞানীরাই দায়ী। আবার অন্য দিকে কেউ কেউ ধ্বংস বা কল্যাণকর প্রয়োগে নিজেদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে 'বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান' বা 'নিজের বুদ্ধিগত আনন্দের প্রয়োজনে বিজ্ঞান' জাতীয় নীতির আশ্রয় গ্রহণ করছেন।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের বর্তমান ফলাফলের প্রশ্নে দায়িত্ব কতখানি বিজ্ঞানীদের এবং কতখানি বাইরের অন্যান্য সামাজিক প্রভাবের সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনো হয় নি; অর্থাৎ এ প্রশ্নের অনেকখানিই আজো বিতর্কমূলক রয়েছে। তবে প্রশ্নটির যে কোন সুস্থ মীমাংসায় পৌঁছবার পথে একথা কিছুতেই ভোলা চলবে না যে, বিজ্ঞান আসলে মানব সভ্যতার আপন প্রয়োজনে উদ্ভূত একটি হাতিয়ার মাত্র। হাতিয়ারের ব্যবহার কল্যাণ এবং অকল্যাণ দু'রকমের প্রয়োজনেই হতে পারে—কোন্ প্রয়োজনে হবে সেটা নির্ভর করবে হাতিয়ারের অধিকারী যে মানুষ তার শুভবুদ্ধি ও বিবেকবোধের ওপরে। শুভবুদ্ধির ওপরে কখনো অকল্যাণ-বুদ্ধিটাই যদি প্রবল হয়ে ওঠে তখন মানব-সমাজের সেই মূঢ়তার জন্য হাতিয়ারমাত্রকেই বিসর্জন দেওয়া কি সুস্থ বুদ্ধির পরিচয় হবে?

আমাদের মতো অনুন্নত, অনগ্রসর দেশের পক্ষে এধরনের প্রশ্ন বিবেচনার ক্ষেত্রে আরো একটি বড় কথা মনে রাখবার রয়েছে। আঠার বা উনিশ শতকে ইউরোপে যে শিল্পবিস্তারের সূত্রপাত হয়েছিল তার অতি ছিটেফোঁটা মাত্র অংশ পেয়েই আমরা নিজেদের আধুনিক জগতের অংশ বলে বিবেচনা করতে শিখেছি। প্রকৃতপক্ষে, অপ্রিয় হলেও স্বীকার করতে হবে, পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বহুল বিস্তার এক ভগ্নাংশমাত্রও হয় নি এবং ঠিক সে অনুপাতেই আমরা দরিদ্র, অনগ্রসর এবং জগৎসভায় অপাংক্তেয় হয়ে রয়েছি। দুনিয়ার অর্ধেকেরও বেশি মানুষ সম্পর্কে এ-কথাটা সত্য।

তাহলে মোটামুটি ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইঃ বর্তমানকাল পর্যন্ত বিজ্ঞানের যা কিছু কল্যাণকর অবদান তাকে পাশ্চাত্য দুনিয়া পুরোমাত্রায় ভোগ করছে; তার এই লাভের দিকের পাশে সে দাঁড় করাচ্ছে পারমাণবিক যুদ্ধের বিভীষিকাকে। আর আমরা লাভের দিক থেকে প্রায় পুরোপুরিই বঞ্চিত রয়েছি, অথচ ঘাটতির দিকে ধ্বংসের বিভীষিকা আমাদের ওপরও প্রায় সমান প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় যে, এ-অবস্থায় ধ্বংসকর প্রয়োগের সম্ভাবনা বন্ধ করে দিয়ে পরমাণু-শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের পথে পাশ্চাত্য দুনিয়ার চাইতে তুলনামূলকভাবে আমাদের লাভের সম্ভাবনা

বেশি। তাছাড়া সাধারণভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেকেও আমাদের এখনো অনেকখানিই লাভবান হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মনে পড়ছে, বছর তিনেক আগে দুনিয়ার সব নোবেল পুরস্কার পাওয়া বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলনের সভাপতি ঘোষণা করেছিলেন, এযাবৎ বিজ্ঞান যেসব সাধারণ শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে শুধু সে-সবেরই পরিপূর্ণ ব্যবহার হলে দুনিয়ার বুকে ছ'শ কোটি লোকের আহার্যের সংস্থান অতি অনায়াসে হতে পারে।

এর সঙ্গে যদি যোগ করা হয় আগামী দিনে পরমাণু-শক্তির নতুন দিগন্ত-বিস্তৃত সম্ভাবনার কথা তাহলে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট আশাবাদী হবার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়; আর শান্তিপূর্ণ সংগঠনের পথে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ভূমিকা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

[১৩৬২/১৯৫৫]

জীবন, বিজ্ঞান ও ভাষা

ভাষার রূপ সম্বন্ধে পন্ডিতজনের মধ্যে মতামতের নানা বিভিন্নতা থাকলেও এবিষয়ে সবাই একমত হবেন যে, ভাষার কাজ হচ্ছে প্রধানত মনের ভাব প্রকাশ। আবার এই ভাব প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য হল পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উপায় এবং উপকরণ হিসেবেই ভাষার প্রধান সার্থকতা। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে সমাজের উৎপাদন প্রক্রিয়ার এবং সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সৌকর্য সাধনেরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

আমাদের পরিবেশের রয়েছে তিনটি মৌল উপাদান। এই তিনটি উপাদানের চরিত্র অনুযায়ী তিন ধরনের নিয়ন্ত্রণের সমস্যা দেখা দেয়। যেহেতু ভাষার জন্য পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, অতএব ভাষাকে এই তিন ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। পরিবেশের এই প্রধান উপাদান তিনটি হলঃ

(ক) আমাদের চারপাশের জড় ও জৈব প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক;

(খ) চারপাশের মানুষের সমাজ—মানুষে মানুষে সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্ক; এবং

(গ) আমাদের নিজের সঙ্গে নিজেরই সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে তার অন্তর্লীণ ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক।

সাহিত্যকে যদি মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের সাথী হতে হয়, ক্রমান্বয়ে তার মানুষের ও তার সমাজের উন্নততর রূপান্তরের সহায়ক হতে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে এই তিন ধরনের উপাদানেরই যোগান দিতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাভাষায় আবেগমূলক রচনার বিকাশ যতখানি, ব্যক্তিমানসের আত্মকন্ডুয়নের চর্চা যত প্রবল, প্রকৃতি সম্পর্কে, প্রকৃতির ওপর মানুষের সম্পর্ক বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক রচনার সংখ্যা তেমনি নগণ্য। বাংলা ভাষায় যত বই প্রতি বছর লেখা হয় বা প্রকাশিত হয় তার শতকরা এক ভাগও প্রকৃতির বিষয়ে, প্রকৃতির নিয়মকানুন বা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ে লেখা হয় কিনা সন্দেহ।

এক হিসেবে মনে হতে পারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক সে তো এক ধরনের আদিম, মৌল সম্পর্ক। সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তার চাইতে জটিলতর এবং নিজের সঙ্গে সম্পর্ক আরো জটিল—প্রায় দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তায় ঢাকা। সেজন্যই আদিম যুগে মানুষের ভাষা ছিল অতি সাদামাটা গদ্য, নিতান্তই প্রয়োজনীয় ক'টি ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে অল্প গুটিকতক শব্দের সমাবেশে তার সৃষ্টি। তারপর সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে সাহিত্যের বিকাশ। সাদামাটা গদ্য থেকে উদ্ভব ঘটেছে কাব্য, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যরূপের।

এই ব্যাখ্যাটা এক হিসেবে সত্যি, আবার সত্যি নয়ও। মনের সুকুমার ভাবের প্রকাশের জন্য ভাষার শব্দসম্ভার বা সৌকর্য যতখানি বেড়েছে, প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনার বর্ণনার জন্য বেড়েছে তার চাইতেও বেশি বই কম নয়। বিশেষ করে বর্তমানকালে আধুনিক যন্ত্রযুগের কল্যাণে, ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, প্রাণের জটিল রহস্য উন্মোচনে, মহাকাশ অভিযানের নিয়ন্ত্রনে বিচিত্র নতুন নতুন শব্দ সম্ভার ভাষায় সৃষ্টি হচ্ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা ভাষার গায়ে এই ভাষাতাত্ত্বিক আলোড়নের ছাপ এখনো পুরোপুরি পড়ে নি। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই যে নতুন ভাষাগত প্রকাশ মাধ্যমের সৃষ্টি হচ্ছে, বাংলা ভাষায় তাকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে না পারলে নিঃসন্দেহে আমরা সভ্যতার অগ্রযাত্রায় পিছিয়ে পড়ব।

সুখের বিষয়, গত এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে বাংলা সাহিত্যের দিকপালরা এ সত্যটি উপলব্ধি করেছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু প্রমুখ লেখক প্রধানত গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি কল্পনানির্ভর রচনায় আত্মনিয়োগ করলেও বাংলা ভাষার দৈন্য উপলব্ধি করে বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাতেও হাত দিয়েছেন।

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে (১২৭৯) সেই প্রবল ইংরেজ আধিপত্যের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করে তার প্রথম সংখ্যাতেই লিখেছিলেনঃ

> যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই; বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখনও বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোনকালেও শুনিবে না। যেকথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর থেকে মাতৃভাষা সম্বন্ধে চেতনা বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রবল হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলনের পরও আমাদের লেখকদের রচনায় ভাষার আবেগমূলক বা হৃদয়মূলক দিকটির ওপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, মননশীল চিন্তা ও কর্মের বাহন হিসেবে ভাষা প্রয়োগের সে ধরনের

উদ্যোগ ততটা চোখে পড়ে না। এযাবৎ এজাতীয় উল্লেখযোগ্য যে ক'টি বই প্রকাশিত হয়েছে তা প্রায় আঙ্গুলে গোনা চলে।

বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আমাদের তিন ধরনের বই-এর প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার প্রয়োজন বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য। প্রধানত বিজ্ঞানীদেরই লিখতে হবে এসব রচনা । যাঁরা লিখবেন তাঁদের একাধারে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখতে হবে, আবার বাংলা ভাষার ওপরও থাকতে হবে যথেষ্ট দখল।

দ্বিতীয়ত দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের নানা বিভাগের জ্ঞান বিস্তৃত করতে হবে। এর কিছুটা হওয়া সম্ভব বিদেশী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদের মাধ্যমে। কিন্তু এদেশের মানুষের প্রয়োজনের উপযোগী বই শুধু এদেশের লোকই যথাযথভাবে লিখতে পারেন। এধরনের বই-এর লেখক বিজ্ঞানী হলেই ভাল, তবে না হলেও চলবে যদি বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশনে কোনরকম বিকৃতি না ঘটে। আবার এর জন্য বৈজ্ঞানিক ও ভাষাবিদদের সম্মিলিত প্রচেষ্টারও প্রয়োজন হতে পারে। তবে যাদের জন্য লেখা তাদের সমস্যা আগে লেখককে গভীরভাবে জানতে হবে। কৃষির উৎকর্ষ সম্বন্ধে বই লিখবেন যে লেখক তাঁর যদি এ দেশের কৃষকের নানা সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা না থাকে তাহলে সে বই লেখা নিরর্থক হবে।

তৃতীয়ত আমাদের দেশের জনসাধারণকে (বিশেষ করে তরুণ সমাজকে) বিজ্ঞানমনা করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞাননির্ভর সাহিত্য। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মুক্ত চিন্তা, পরীক্ষা-নির্ভরতা, কুসংস্কারে অবিশ্বাস, প্রকৃতির কল্যাণকর রূপান্তরের প্রেরণা সঞ্চারিত করতে হবে আমাদের সমগ্র সাহিত্যে। এজন্য বর্তমান যুগের চালিকাশক্তি যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল এবং বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমাদের সব সাহিত্যিকের অবশ্য প্রয়োজন।

বিজ্ঞান বিষয়ে রচনার ভঙ্গি কি হবে সে সম্বন্ধে শেষ কথা বলা সময় এখনো আসে নি। এবিষয়ে নানা জনের নানা মত রয়েছে এবং বর্তমান স্তরে রচনাশৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ পাঠকের জন্য বৈজ্ঞানিক রচনায় যথাসম্ভব সহজ সরল ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী। তবে বিজ্ঞানীদের নিজেদের মধ্যে ব্যবহারের জন্য যেসব রচনা তা যে সকলের জন্যই সুবোধ্য হবে এমন প্রত্যাশা বা দাবী কেউই করবেন না। বরং সাধারণ মানুষদের জন্য যেমন, তেমনি নানা স্তরের বিশেষজ্ঞদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা তৈরির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাও ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

বৈজ্ঞানিক রচনার প্রসঙ্গে পরিভাষার প্রশ্ন কেউ কেউ তোলেন, এবং এসম্পর্কেও বর্তমান অবস্থায় সর্বসম্মত কোন নীতি রয়েছে বলে মনে হয় না। শ্রদ্ধেয় ডঃ মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি প্রায় সব বৈজ্ঞানিক শব্দেরই বাংলা প্রতিশব্দ গ্রহণের পক্ষপাতী। আবার বন্ধুবর সুবোধ দাশগুপ্ত 'অ্যাটম', 'এনার্জি' এসব শব্দও বাংলায় চালিয়ে দেবার পক্ষে। বলাবাহুল্য রচনার নৈপুণ্য ও ভাষার প্রসাদগুণে এঁরা দু'জনেই প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় লেখক।

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক রচনার প্রশ্নটি আমাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সাংস্কৃতিক অগ্রগতির কথা কল্পনা করা যায় না। এই সত্যটি উপলব্ধি না করলে বৈজ্ঞানিক রচনার সমস্যাটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার এবং এর সমাধানের দায়িত্বকে খাটো করে ফেলার আশঙ্কা রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক রচনার ক্ষেত্রে আমাদের জনশক্তি বর্তমানে নিঃসন্দেহে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ জনশক্তির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। এদেশে যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিজ্ঞানকর্মী রয়েছেন তাঁদের সকলের সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে সংগঠিত করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশে যে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক জাগরণের সমস্যা, জনসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি উদ্বোধনের সমস্যা, তার সমাধানের দায়িত্ব প্রধানত ভাষা আন্দোলনের ও মুক্তি সংগ্রামের অভিজ্ঞতাস্নাত আমাদের দেশের তরুণ সমাজকেই নিতে হবে। মূলত দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবন সমস্যার প্রয়োজনে তরুণ সমাজ ভাষা ও বিজ্ঞানের হাতিয়ার প্রয়োগে উদ্যোগী হলেই কেবল আমাদের উদ্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ সম্ভব হবে।

[১৩৭৬/১৯৭০]

বিজ্ঞান ও সমাজ

[মূলঃ আলবার্ট আইনস্টাইন। আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) একালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী শুধু নন, এযুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিকও। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরোধা বলে তিনি সমাজনিরপেক্ষ থাকেন নি। বিজ্ঞানের জটিল রহস্য নিয়ে নিবিষ্ট সাধনায় রত থেকেও নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে হয়েছেন উচ্চকণ্ঠ; বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন নিজের মতামত। ১৯৩৫ সালে তিনি 'বিজ্ঞান ও সমাজ' নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন আজো তার মূল্য কিছুমাত্র কম মনে হয় না—এথেকেই সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাবে।]

সমাজের ওপর বিজ্ঞানের প্রভাব পড়ে দু'রকমভাবে। তার মধ্যে একটা দিকের কথা সবারই জানা আছে; প্রত্যক্ষ এবং তারও বেশি পরোক্ষভাবে, বিজ্ঞান এমন সব জিনিসের উদ্ভাবন ঘটায় যা মানুষের জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে আমূল রূপান্তর আনে। প্রভাবের দ্বিতীয় দিকটা হচ্ছে শিক্ষামূলক—তার কাজ মানুষের মনের ওপরে। আপাতদৃষ্টিতে এদিকটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে না হলেও আসলে প্রথম দিকের চেয়ে এই দ্বিতীয় প্রভাবের গভীরতা কিছুমাত্র কম নয়।

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে যে জিনিসটা সব চাইতে বড় হয়ে চোখে পড়ে সে হল, বিজ্ঞান ক্রমাগত নানা নতুন নতুন আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে (যদিও সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা জটিলও করে); যেমন বাষ্পীয় যান, রেলগাড়ি, বৈদ্যুতিক শক্তি ও আলো, টেলিগ্রাফ, বেতার, মোটর গাড়ি, উড়োজাহাজ, ডিনামাইট প্রভৃতি আবিষ্কারের উল্লেখ করা যেতে পারে। তার সঙ্গে অবশ্য যোগ করতে হবে মানুষের জীবন রক্ষায় জীব-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কৃতিত্বের কথা—বিশেষ করে যন্ত্রণার উপশমে এবং খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ-ব্যবস্থার উদ্ভাবনে তাদের অবদান। আমার মনে হয় এসব আবিষ্কার থেকে মানুষের সবচেয়ে বড় লাভ এই হয়েছে যে, এককালে নিতান্ত জীবন-ধারণের জন্য যে অমানুষিক পেশীচালনা ছিল অপরিহার্য, তার হাত থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে, আর দাস প্রথার অবসান আজ যে-পরিমাণে ঘটেছে তা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগেরই কল্যাণে।

কিন্তু অন্যদিকে, প্রযুক্তিবিদ্যা বা ফলিত বিজ্ঞান মানুষের সামনে কতকগুলো গভীর সমস্যা এনে দাঁড় করিয়েছে। এমন কি মানুষের অস্তিত্বটুকুও আজ নির্ভর করছে এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের ওপর। প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এমন এক ধরনের

সামাজিক সংগঠন ও সামাজিক ঐতিহ্য গড়ে তোলার যার অভাবে এসব নতুন যন্ত্র ভয়াবহতম বিপর্যয় ডেকে আনবে।

অসংগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, জনসংখ্যার একটা বড় অংশ আজ উৎপাদন ব্যবস্থার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং তার ফলে অর্থনৈতিক বিলিব্যবস্থার ক্ষেত্র থেকে বাতিল হয়ে পড়েছে। আর এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে দেখা দিয়েছে ক্রয়-ক্ষমতার অধোগতি, অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার ফলে শ্রমের মূল্য হ্রাস এবং শেষ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান দ্রুততায় উৎপাদন ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক সংকট ও বিপর্যয়। অথচ উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানার সঙ্গে এমন এক ধরনের ক্ষমতা রয়েছে যার বিরুদ্ধে আমাদের প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্থাগুলো এঁটে উঠতে পারছে না। সমগ্র মানব জাতির সামনে আজ সংগ্রাম দেখা দিয়েছে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার; বর্তমান যুগের মানুষ যদি নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে তাহলে এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই হয়তো সত্যিকার মুক্তি আসবে।

তাছাড়া প্রযুক্তিবিদ্যা দূরত্বকে দিয়েছে কমিয়ে এবং ধ্বংসের এমন সব নতুন ও অসাধারণ উপায় উদ্ভাবন করেছে যে, এগুলো বেপরোয়া ক্ষমতা-বিলাসী কোন জাতির হাতে পড়লে মানুষের নিরাপত্তা এমন কি তার সমগ্র অস্তিত্বের পক্ষেই বিপদ দেখা দেবে। এ অবস্থায় প্রয়োজন এমন এক বিশ্বসংস্থা যা সমগ্র পৃথিবীতেই তার বিচার ও শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে; কিন্তু মানুষের জাতিগত ঐতিহ্য এরকম বিশ্বসংস্থা গঠনের প্রবল প্রতিবন্ধক। এখানেও আমরা মানব জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ামক সেই একই ধরনের সংগ্রামের সম্মুখীন।

যোগাযোগ ব্যবস্থা, মুদ্রাযন্ত্র এবং বেতার—সব কিছু যখন আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন কোন এক কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে মানুষকে দৈহিক ও নৈতিক দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা কঠিন হয় না; এই হল মানব জাতির সামনে তৃতীয় বিপদ। আধুনিক যুগের স্বৈরতন্ত্র এবং তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, বিজ্ঞানের এসব আবিষ্কারকে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে সুপরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহার করা থেকে আমরা এখনো অনেক দূরে রয়েছি। এখানেও সমস্যার সমাধান প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে; কিন্তু সে সমাধানের মানসিক ভিত্তি এখনো তৈরি হয় নি।

এবার বিজ্ঞানের বুদ্ধিগত প্রভাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাক। ... প্রাক-বিজ্ঞান যুগে শুধু মানস-সম্পদের সাহায্যে সমগ্র মানব জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য কোন ফলাফল অর্জন করা সম্ভব ছিল না। সকল প্রাকৃতিক ঘটনার পেছনে যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম কাজ করে যাচ্ছে সেকথাও মানুষ ভাবতে পারত না। প্রকৃতি সম্পর্কে আদিম মানুষের খণ্ডিত জ্ঞান জন্ম দিয়েছিল অপদেবতা ও অশরীরী প্রেতাত্মার। আর তাই আজও আদিম সমাজের মানুষ কোন রহস্যময় আধিভৌতিক শক্তি তার ভাগ্যে বিপর্যয় ঘটাবে এই ভয় থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারে না।

বিজ্ঞানের এটা এক অবিস্মরণীয় কীর্তি বলতে হবে যে, মানুষের মনের ওপর বিজ্ঞানের প্রভাবের ফলেই আজ সে তার নিজের বা প্রকৃতির সম্পর্কে ভয় ও অসহায়তার ভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। গণিতশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করে গ্রীকরাই প্রথম এমন এক চিন্তাপদ্ধতির সূত্রপাত করেন যার সিদ্ধান্ত সকলে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে। তারপর রেনেসাঁর যুগের বিজ্ঞানীরা গাণিতিক পদ্ধতির সঙ্গে সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সমন্বয় ঘটালেন। এই সমন্বয়ের ফলে প্রাকৃতিক নিয়মের বর্ণনায় এমন সূক্ষ্মতা এবং পরীক্ষার সাহায্যে তার সত্যাসত্য নির্ধারণের এমন নিশ্চয়তা লাভ হল যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক মতবিরোধের আর কোন অবকাশ রইল না। তারপর থেকে যুগ যুগ ধরে মানুষ বংশ-পরম্পরায় তার জ্ঞান ও উপলব্ধির ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে—কিন্তু কখনোই এমন সংকট দেখা দেয় নি যাতে জ্ঞানের সমগ্র সঞ্চিত সম্পদ ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।

জনসাধারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ হয়তো সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারেন না। কিন্তু যেটুকু পারেন তারও বিরাট মূল্য রয়েছে; তা থেকে তাঁরা এই বিশ্বাস লাভ করতে পারেন যে, মানুষের চিন্তাসম্পদ নির্ভরযোগ্য এবং প্রাকৃতিক নিয়ম সর্বব্যাপী।

[১৩৬২/১৯৫৫]